

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ



ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର



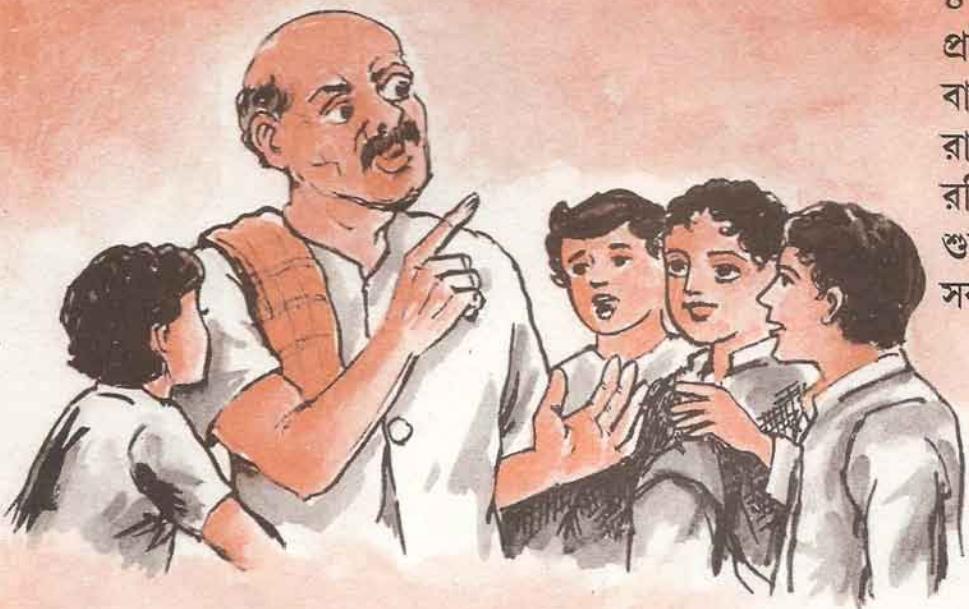
୨। ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବ୍ୟବସାର କାଜେ
ବେଶୀର ଭାଗ ସମୟଟି ବାଡ଼ୀର
ଥାଇରେ ଥାକତେନ ।

୧। ଜୋଡ଼ାସାଂକୋ ଠାକୁର ବାଡ଼ୀତେ ୨୫୪୯
ବୈଶାଖ ୧୨୬୮ ସାଲେ (ଇଂ ୭୩ ମେ,
୧୮୬୧) ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେନ ।
ପିତା ମହିର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଠାକୁର ଓ
ମାତା ସାରଦାଦେବୀ ।



୩। ସାରଦାଦେବୀ ଓ
ବାଡ଼ୀର କାଜେ ବ୍ୟକ୍ତ ଥାକାଯ
ଛୋଟୁ ରବିକେ ଦେଖାଶୋନା କରତୋ
ଈଶ୍ୱର ନାମେ ଏକ ଭୃତ୍ୟ ।

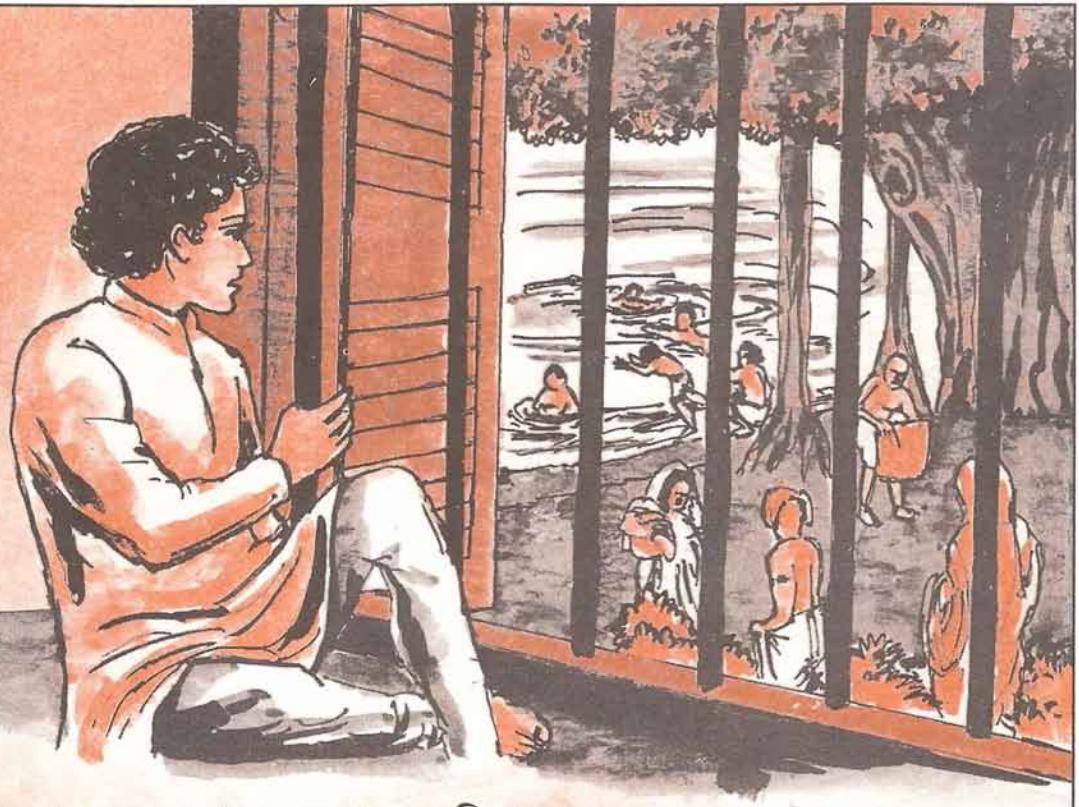
৪। ঈশ্বর প্রতিদিন সন্ধ্যায়
প্রদীপের আলোয় রবি ও
বাড়ীর অন্যান্য ছেটদের
রামায়ণ কাহিনী বলতো,
রবি সে সব একমনে
শুনতো এবং তার মনে
সব গাঁথা হয়ে গিয়েছিল।



৫। শ্যাম নামে তাদের আর এক
ভৃত্য রবিকে সীতা অপহরণের
গন্ধ বলে গাণ্ডি টেনে এক
জায়গায় আটকে রাখতো।



৬। গণ্ডির বাইরে যাওয়ার কথা
মনে হলেই রবির সেই গন্ধ মনে
পড়তো এবং ভয় পেত।



৭। শুধু একটা খোলা জানালা তার বন্ধ ঘরে মুক্তির
স্বাদ এনে দিত। বাইরের মানুষের মুক্ত জীবন তাকে
গভীরভাবে আকর্ষণ করতো। সারাদিন বসে
বসে তাদের কাজের খুঁটিনাটি লক্ষ্য করতো।



এরপর রবি
বিদ্যালয়ে ভর্তি
হলো। কিন্তু সেখানকার
বাঁধাধরা পরিবেশ তার
অসহ্য লাগতো। শিক্ষকদের ঝাড়
ব্যবহারও তাকে আরও পড়াশোনায়
বিমুখ করে তুলেছিল।

৯। স্কুল স্কুল ছিল
রবির প্রিয় খেলা।
বারান্দার
রেলিংগুলোকে
ছাত্র করে রবি
নিজে হতো
গুরুমশাই।



১০। অমনোযোগিতার
জন্য যে শাস্তি শিক্ষকরা
দিত, সেই শাস্তি পড়ত
ছেট্ট রবির ছাত্র
সেইসব রেলিং
গুলোর ওপর।



১১। অঘোরবাবু রবি ও কয়েকজনকে
ইংরেজী পড়াতেন। শিক্ষকদের প্রথাগত
পড়ানোয় রবি কখনও খুশী ছিল না। এক
বৃষ্টির সম্মায় শিক্ষক আসবেন না মনে
করে ছেলেরা আনন্দে মশগুল।





১২। কিন্তু হঠাৎ রবি লক্ষ্য করলো সেই দুর্ঘাগপূর্ণ আবহাওয়াতেও ছাতা মাথায় অঘোরবাবু এসে উপস্থিত হয়েছেন। আনন্দের ফানুস চুপসে গেল।



১৩। কয়েকদিনের ছুটি অবশ্যে রবিরা পেয়েছিল, ভারতীয় আর ফিরিঙ্গি ছাত্রদের লড়াইতে অঘোরবাবু আহত হয়েছিলেন।

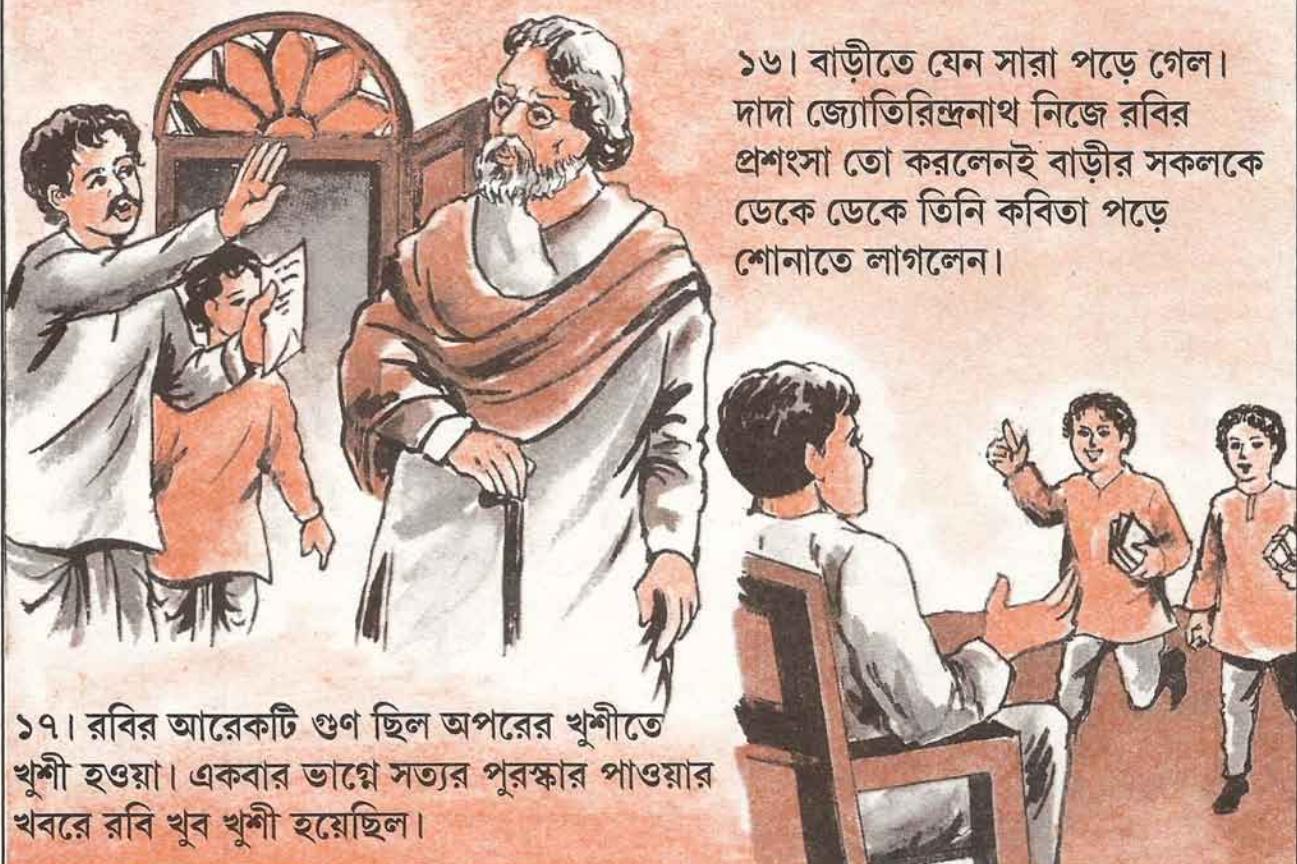
১৪। রবির সমবয়সী এক ভাইপো এরপর তাকে কবিতা লিখতে অনুপ্রাণিত করলো।
রবি প্রথমে বেশ অবাক হয়ে গেল।



১৫। তার অনুপ্রেরণাতেই
রবীন্দ্রনাথ লিখলো তার প্রথম
কবিতা। এখন তার বয়স
আটের কাছাকাছি। প্রথম
কবিতাই পেল অকৃষ্ণ প্রশংসা।



১৬। বাড়ীতে যেন সারা পড়ে গেল।
দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজে রবির
প্রশংসা তো করলেনই বাড়ীর সকলকে
ডেকে ডেকে তিনি কবিতা পড়ে
শোনাতে লাগলেন।



১৭। রবির আরেকটি গুণ ছিল অপরের খুশীতে
খুশী হওয়া। একবার ভাগ্নে সত্যর পুরস্কার পাওয়ার
খবরে রবি খুব খুশী হয়েছিল।

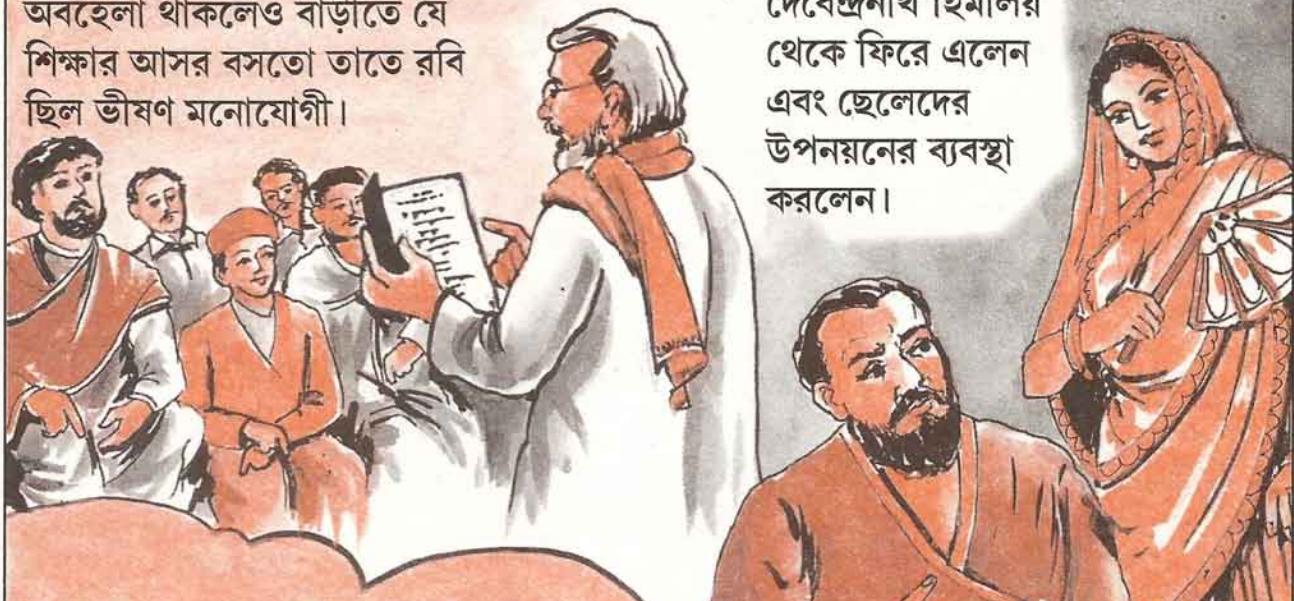
১৮। বয়স একটু বাড়ার
সঙ্গে সঙ্গে স্কুল থেকে
পালিয়ে প্রকৃতির
মাৰখানে রবি নিজেকে
খুঁজে পেতে লাগলো।



১৯। স্কুল থেকে
পালিয়ে যাওয়ার
খবরে বাড়ীর
লোকেরা ভীষণভাবে
চিন্তিত হয়ে
পড়লো।

২০। দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ
ও বৌদি কাদম্বরীদেবী
ছিলেন রবিৰ কবিতাৱ
সমবাদার পাঠক। তাঁৰা
তাৰ মধ্যে তখনই এক
প্রকৃত কবিকে খুঁজে
পেয়েছিলেন।

২১। স্কুলের গতানুগতিক শিক্ষায়
অবহেলা থাকলেও বাড়ীতে যে
শিক্ষার আসর বসতো তাতে রবি
ছিল ভীষণ মনোযোগী।



২৩। উপনয়নের আগে রবি ও অন্য
দু'জনকে পশ্চিতের কাছে ভালভাবে সংস্কৃত
শ্লোক শিখতে হলো।



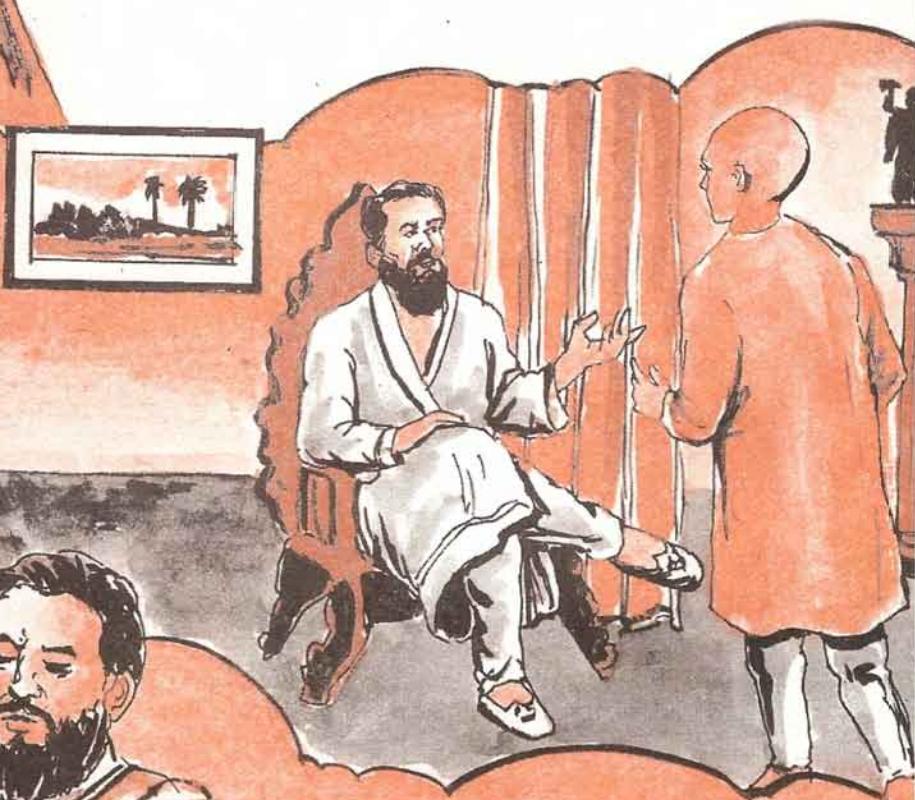
২৪। তারপর আচার অনুষ্ঠান করে
তাদের উপনয়ন সম্পন্ন হলো।

২২। এরপর
দেবেন্দ্রনাথ হিমালয়
থেকে ফিরে এলেন
এবং ছেলেদের
উপনয়নের ব্যবস্থা
করলেন।



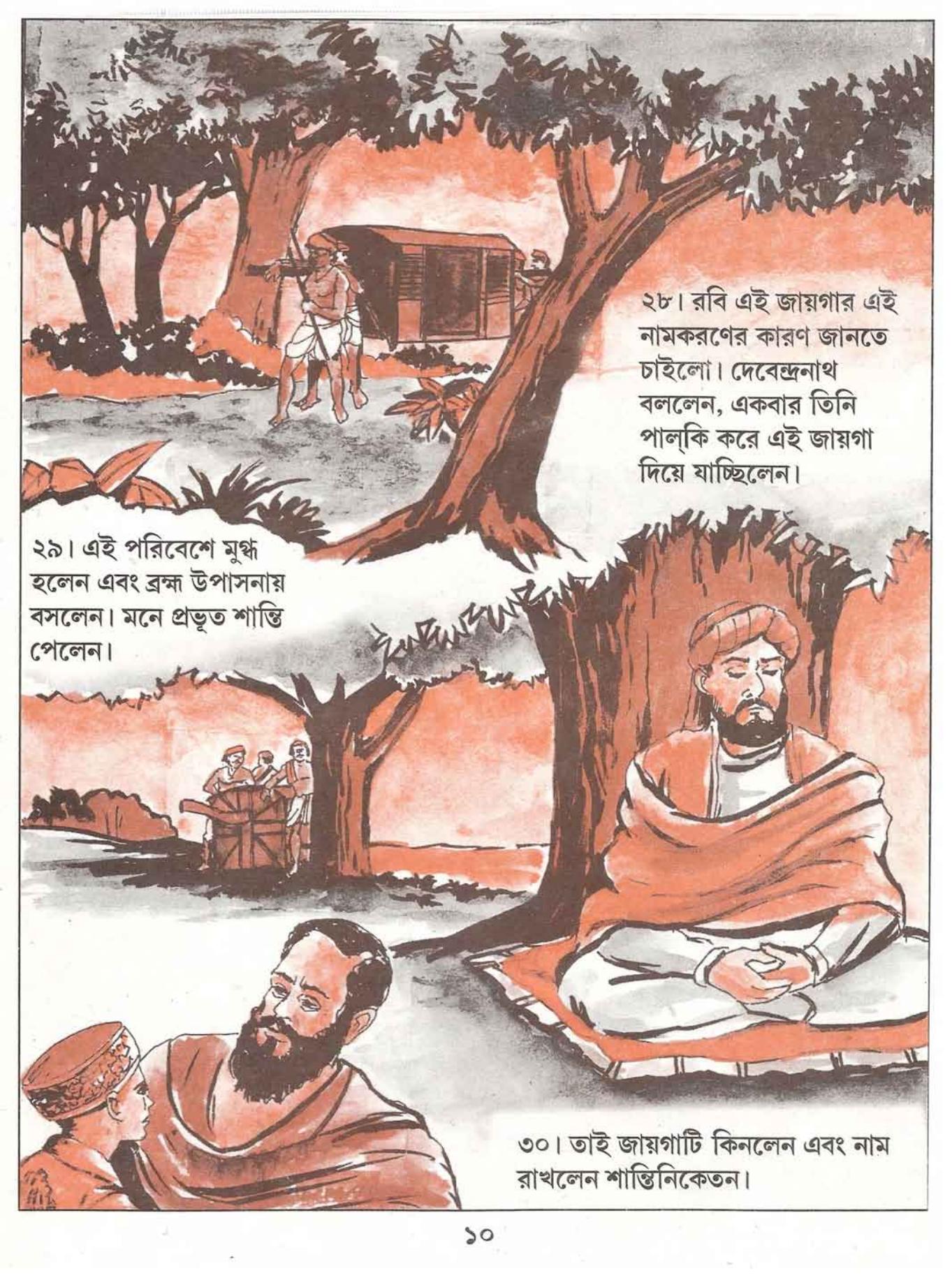
২৫। স্কুলের পরিবেশ একেই তো রবির কাছে ছিল
বিরক্তিকর, তার ওপর ছাত্রদের অত্যাচারে নেড়া মাথা
নিয়ে স্কুলে যাওয়া একরকম অসম্ভব হয়ে উঠল।

২৬। এই অবস্থায় পিতা
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রবিকে
প্রস্তাব দিলেন হিমালয়ে
যাওয়ার। রবি সঙ্গে সঙ্গে
রাজী হয়ে গেলো।



২৭। হিমালয়
যাওয়ার পথে পড়ল
বোলপুরের মনোরম
শান্তিনিকেতন।
প্রাকৃতিক সৌন্দর্য
অতুলনীয়।





২৮। রবি এই জায়গার এই
নামকরণের কারণ জানতে
চাইলো। দেবেন্দ্রনাথ
বললেন, একবার তিনি
পাল্কি করে এই জায়গা
দিয়ে ঘাসিলেন।

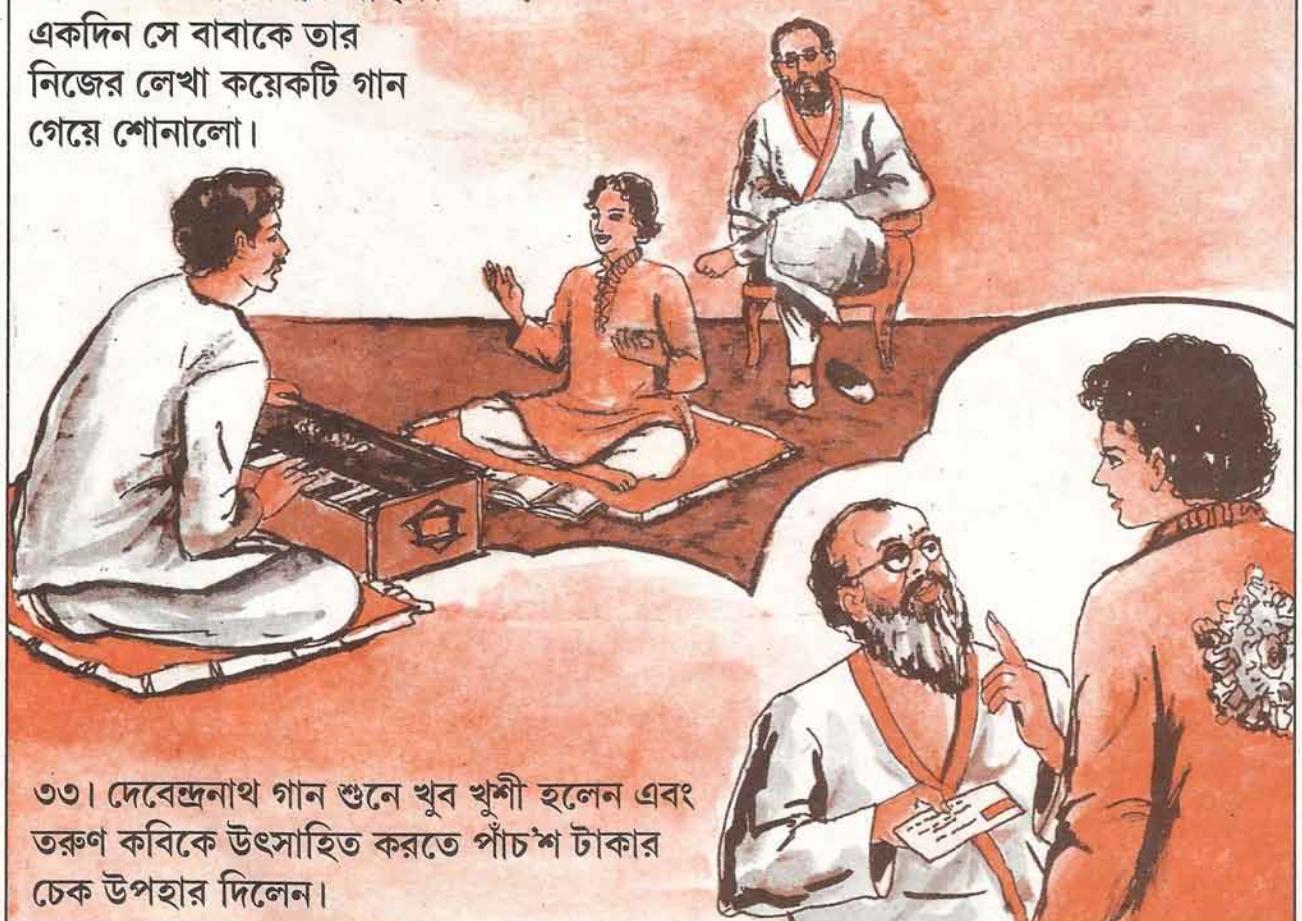
২৯। এই পরিবেশে মুঢ়
হলেন এবং ব্রহ্ম উপাসনায়
বসলেন। মনে প্রভৃত শান্তি
পেলেন।

৩০। তাই জায়গাটি কিনলেন এবং নাম
রাখলেন শান্তিনিকেতন।

৩১। তারপর অম্বতসর হয়ে হিমালয় গেলেন, এই ভ্রমণে রবির দেশ দেখা সম্পূর্ণ হলো,
প্রকৃতির বিভিন্ন বিষয় পিতার কাছে বুঝে নিলো।



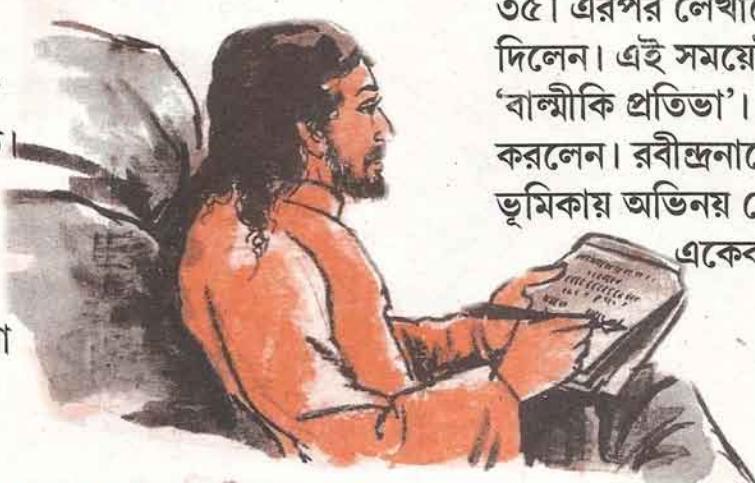
৩২। সঙ্গে সঙ্গে রবির
গান ও কবিতা লেখা চলছিল।
একদিন সে বাবাকে তার
নিজের লেখা কয়েকটি গান
গেয়ে শোনালো।



৩৩। দেবেন্দ্রনাথ গান শুনে খুব খুশী হলেন এবং
তরঞ্জ কবিকে উৎসাহিত করতে পাঁচ'শ টাকার
চেক উপহার দিলেন।



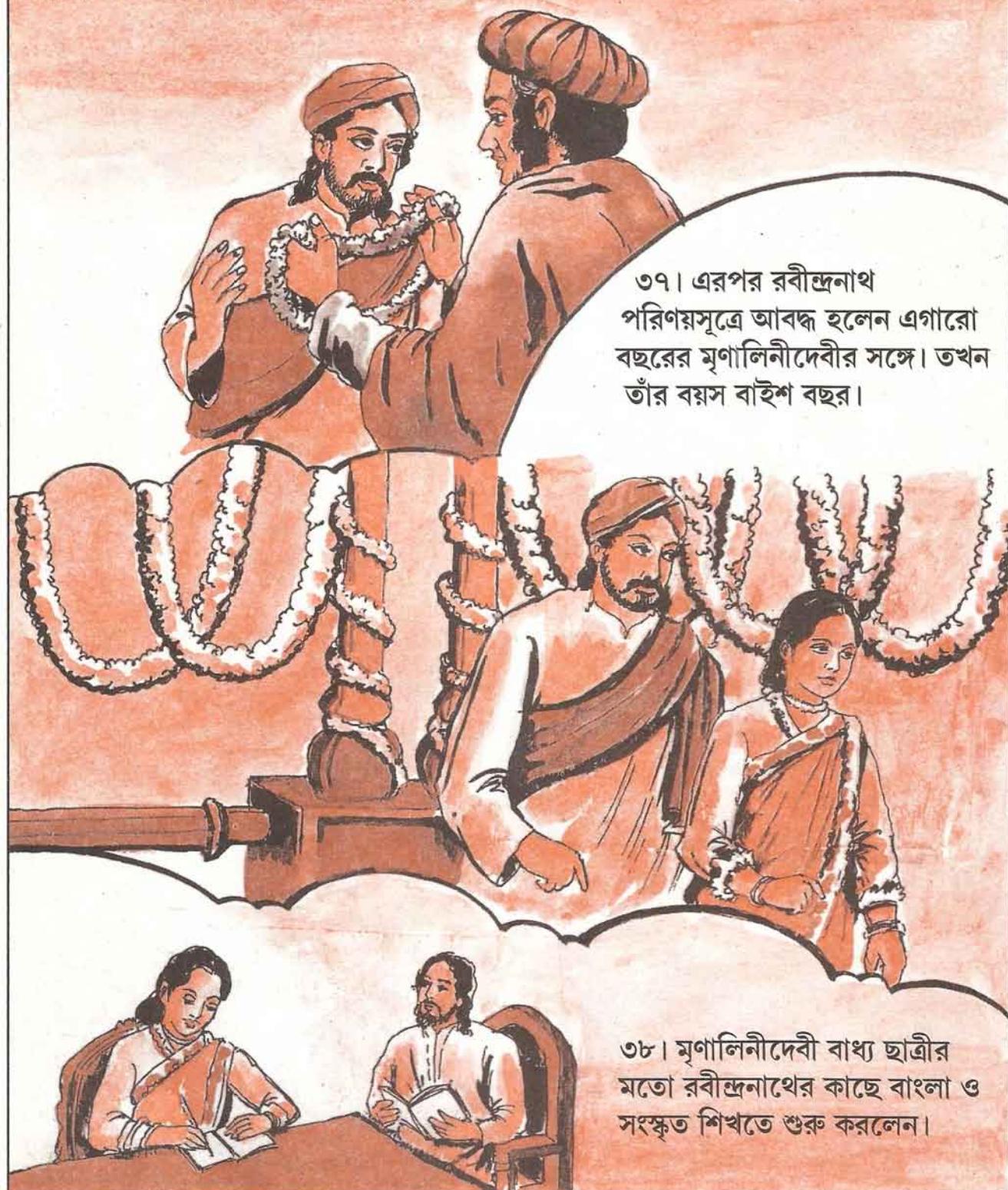
৩৪। তাঁর তখন
সতেরো বছর বয়স।
তিনি গেলেন বিলেতে
উচ্চশিক্ষা লাভ করতে।
কিন্তু সেখানকার
বাঁধাধরা পড়াশোনাও
তাঁর ভালো লাগলো
না। পড়াশোনা শেষ না
করেই ফিরে এলেন
সতেরো মাস পরে।



৩৫। এরপর লেখাতেই বেশী সময়
দিলেন। এই সময়েই লিখলেন
'বাল্মীকি প্রতিভা'। সেটি অভিনয়ও
করলেন। রবীন্দ্রনাথের বাল্মীকির
ভূমিকায় অভিনয় দেখে সকলে
একেবারে মুগ্ধ।



৩৬। এরপর থেকে রবীন্দ্রনাথের লেখনী অবিরাম গতিতে চলতে লাগলো। জনস্বীকৃতি ও সম্বৰ্ধনার প্রবাহ চলতে লাগলো। অগ্রণী সাহিত্যিক খায়ি বক্ষিমচন্দ্ৰ রবীন্দ্রনাথকে স্বীকৃতি জানালেন। রবীন্দ্রনাথ তা সাদৰে গ্ৰহণ কৱলেন।

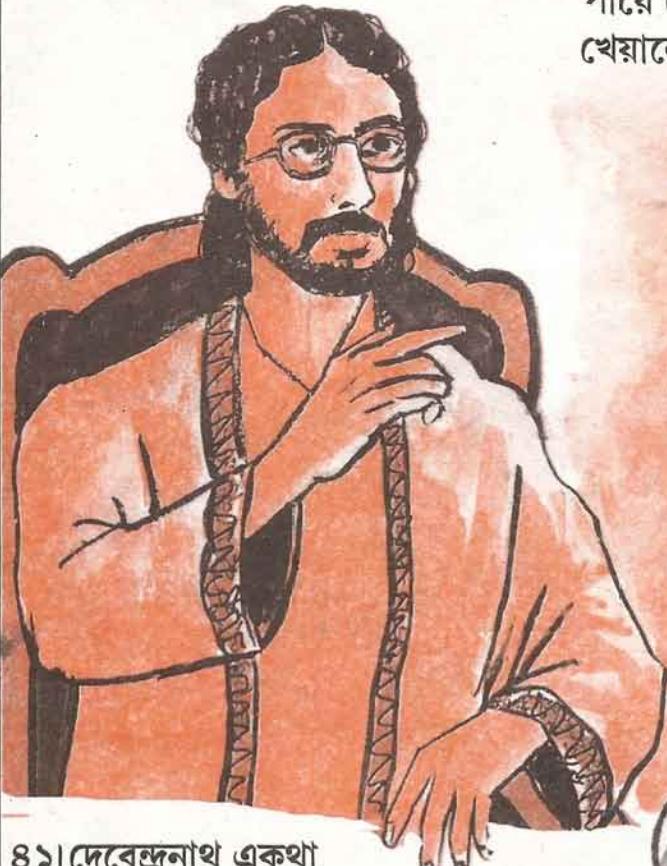


৩৭। এরপর রবীন্দ্রনাথ
পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হলেন এগারো
বছরের মৃণালিনীদেবীর সঙ্গে। তখন
তাঁর বয়স বাইশ বছর।

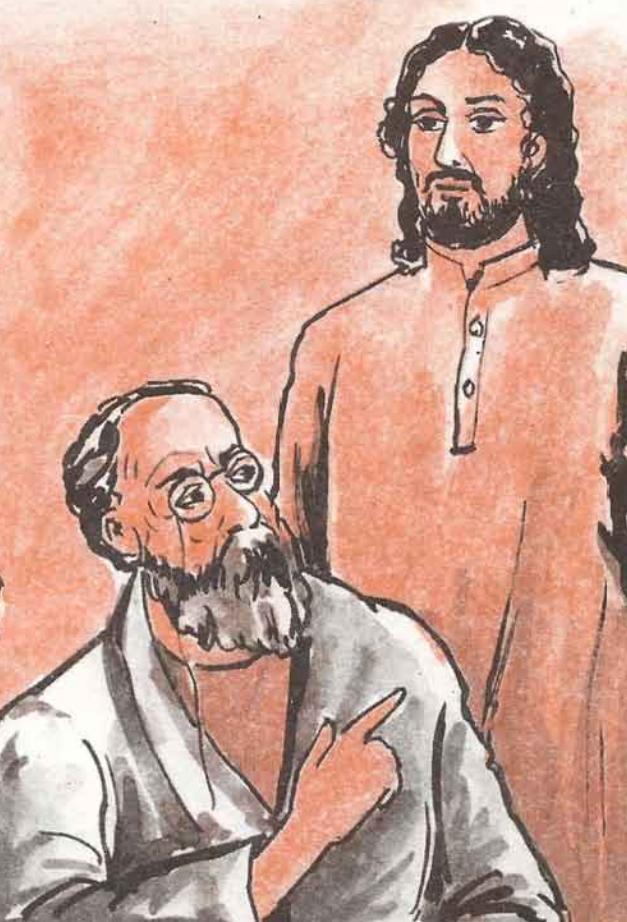
৩৮। মৃণালিনীদেবী বাধ্য ছাত্রীর
মতো রবীন্দ্রনাথের কাছে বাংলা ও
সংস্কৃত শিখতে শুরু কৱলেন।



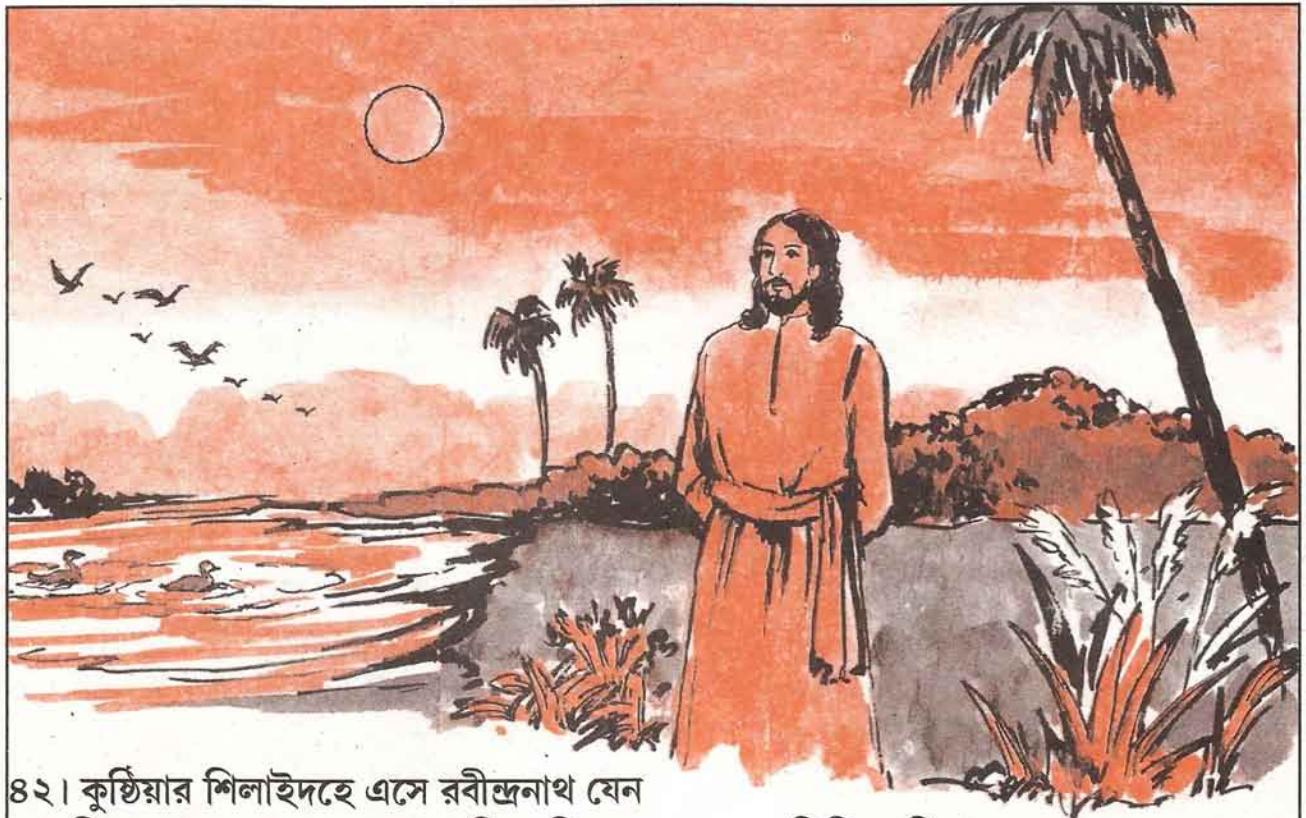
৩৯। এর মাত্র চারমাস
পরে কবিকে মুখোমুখি
হতে হয় এক দুঃখজনক
ঘটনায়। বউঠাকুরাণী
কাদশ্বরীদেবী পরলোক
গমন করেন। এতে কবি
গভীর আঘাত পান।
পরবর্তীকালে তাঁর রচনায়
এর প্রভাব পড়েছিল।



৪০। এরপর কবির এক অঙ্গুত ইচ্ছা হলো।
তিনি ঠিক করলেন কলকাতা থেকে পেশোয়ার
পায়ে হেঁটে ভ্রমণ করবেন। বন্ধুরা তাঁর এই
খেয়ালে বেশ অবাক হয়ে গেলেন।



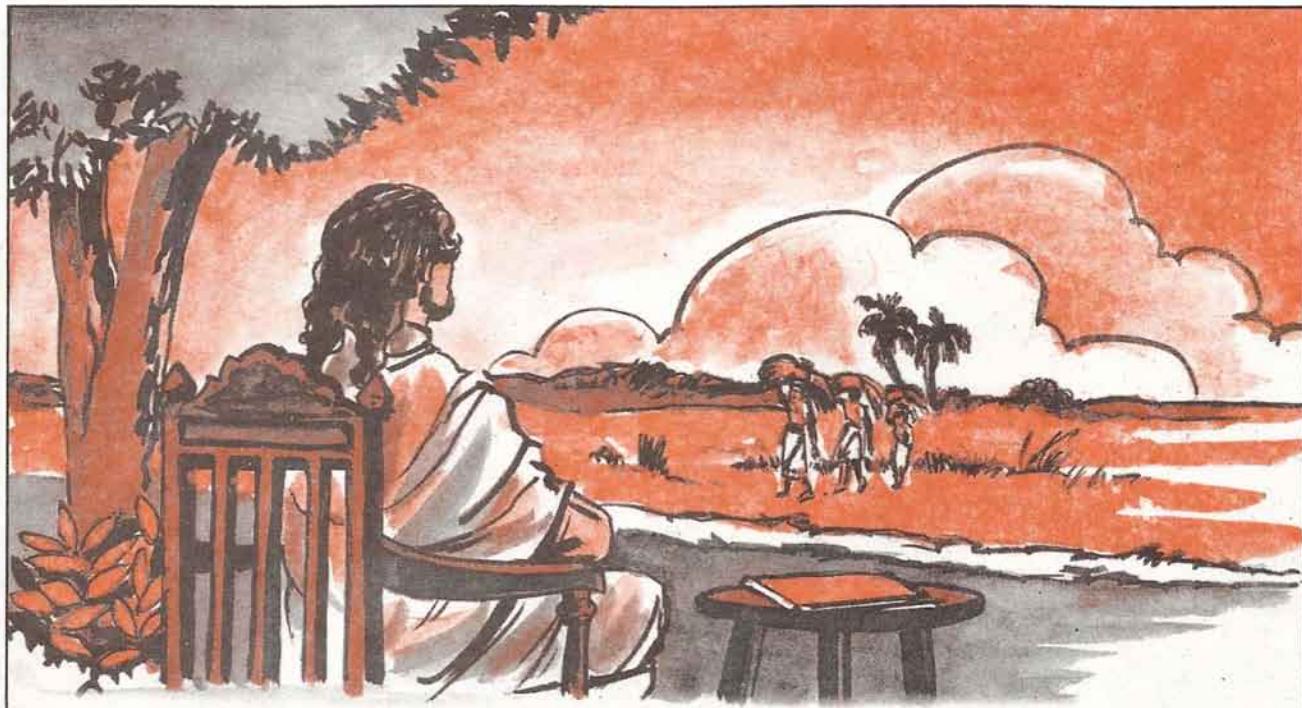
৪১। দেবেন্দ্রনাথ একথা
জানতে পেরে তাঁকে ডেকে পাঠালেন এবং
বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত কুষ্ঠিয়ার
জমিদারী দেখাশোনার দায়িত্ব দিলেন।



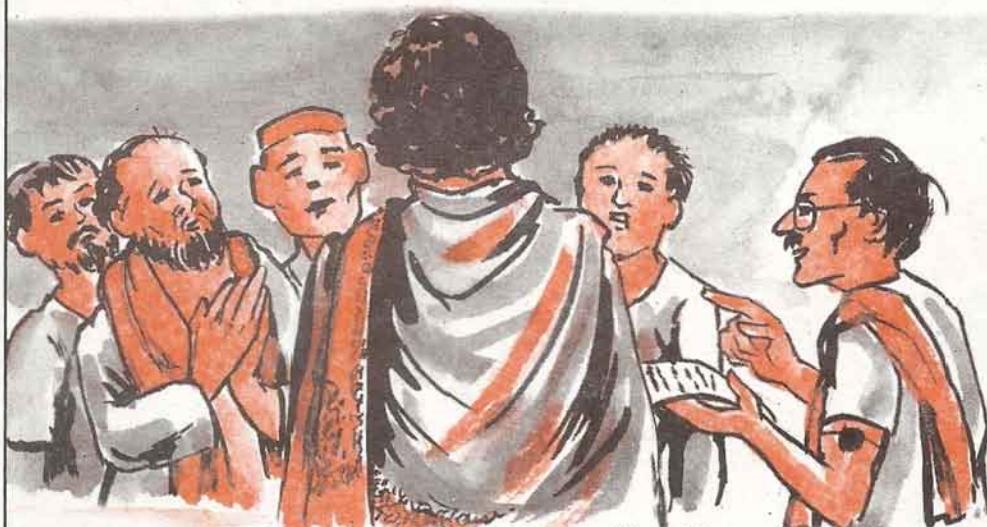
৪২। কুষ্ঠিয়ার শিলাইদহে এসে রবীন্দ্রনাথ যেন
প্রকৃতির কোলে আশ্রয় পেলেন। দিনগুলিকে নতুন করে তিনি আবিষ্কার করলেন।
পল্লী প্রকৃতির প্রভাবে তাঁর কবি মন উজ্জীবিত হয়ে উঠলো।



৪৩। জমিদারীর
কাজে পদ্মার বুকে
নৌকায় করে
ঘূরতে হতো।
প্রকৃতির নিবড়
প্রশান্তি আর দাঁড়
টানার শব্দ মাঝির
গানের সঙ্গে মিশে
এক অপূর্ব
পরিবেশ তৈরী
করতো। কবি মুঢ়
হয়ে যেতেন।



৪৪। তিনি পরিশমী মানুষদের জীবনযাত্রা খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। তাদের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঞ্চ্ছা তাঁর লেখার বিষয় হয়ে উঠল।



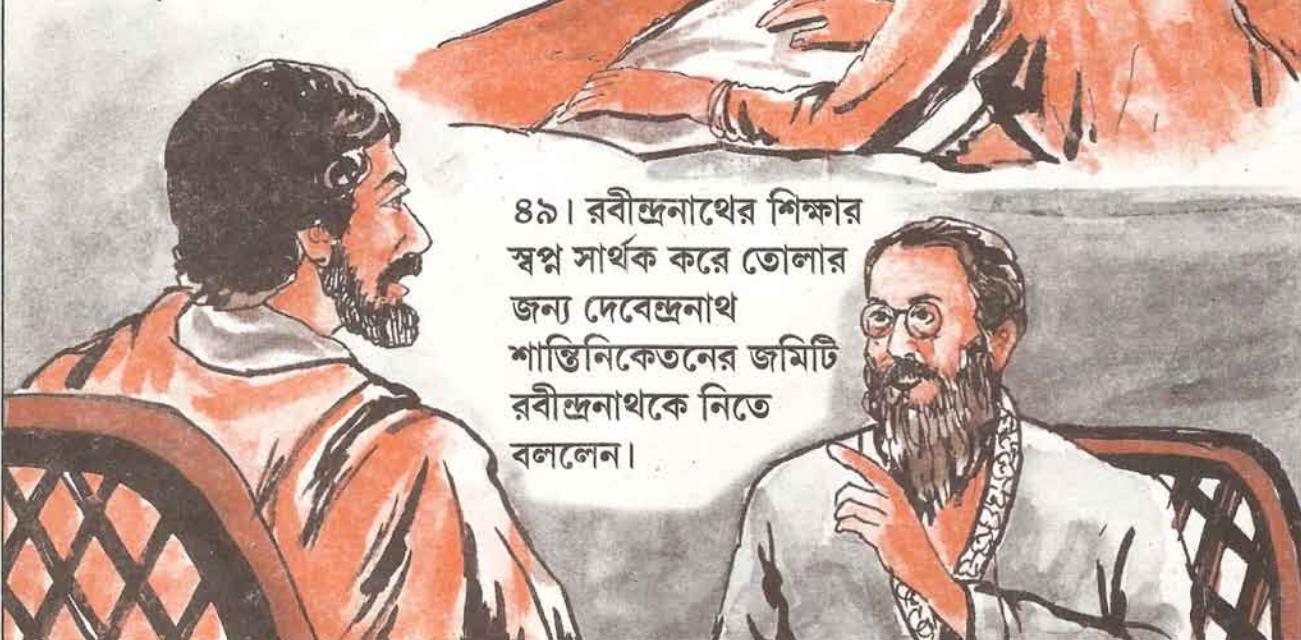
৪৫। জমিদার হিসাবে
তিনি ছিলেন উদার।
প্রজার অভাব
অভিযোগ মন দিয়ে
শুনতেন। খরা-বন্যায়
প্রায়ই খাজনা মুকুব
করে দিতেন।



৪৭। সাধারণ কৃষকদের মাঝে থেকে তাদের ব্যথা তাঁকে ভাবাতো। তাদের কুসংস্কার
ভাঙ্গতে হবে এই ভাবনায় তিনি সকলের সঙ্গে আলোচনা করতেন।



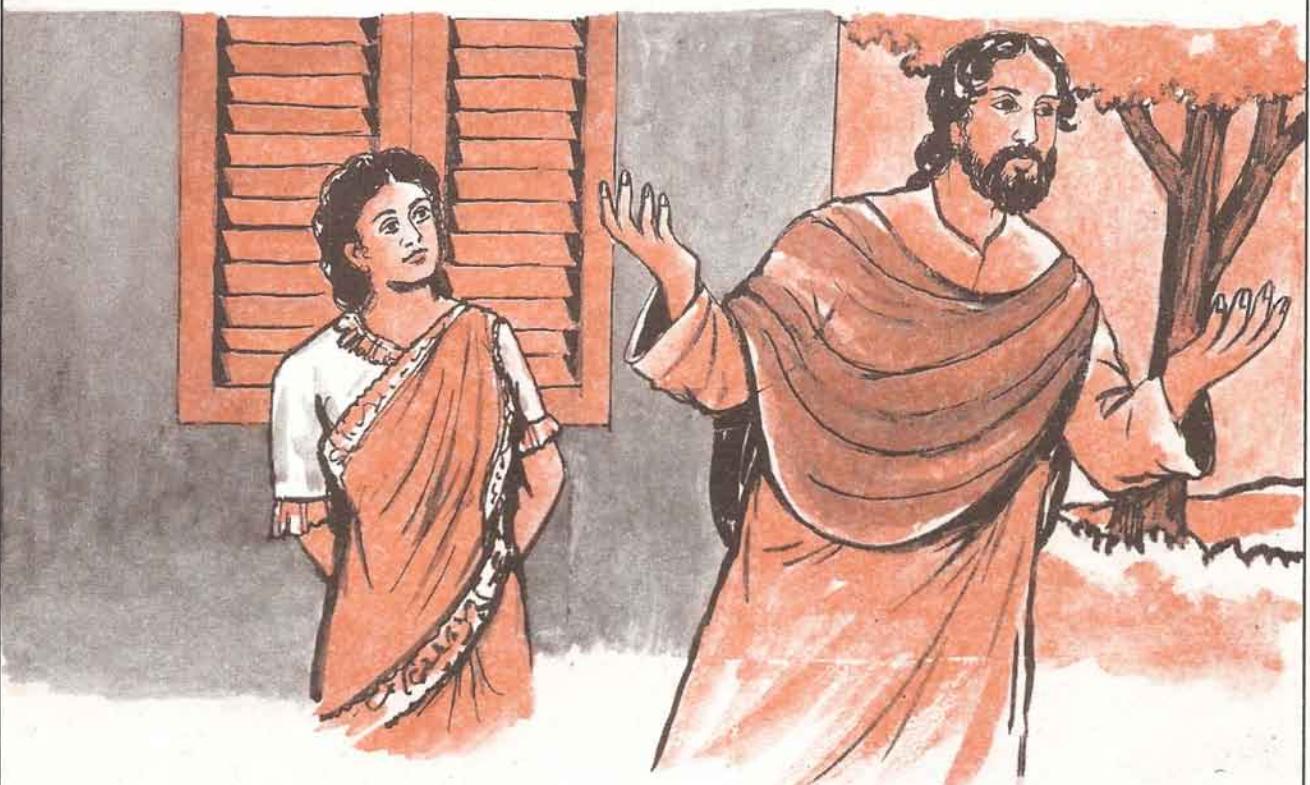
৪৮। তিনি এদের জন্য এমন এক শিক্ষার
কথা ভাবতেন যা ছিল সর্বাধুনিক ও
বিজ্ঞানসম্মত। শিক্ষার প্রসারের জন্য তিনি
উঠে পড়ে লাগলেন।



৪৯। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার
স্বপ্ন সার্থক করে তোলার
জন্য দেবেন্দ্রনাথ
শাস্ত্রনিকেতনের জমিটি
রবীন্দ্রনাথকে নিতে
বললেন।



৫০। তাঁর সর্বক্ষণের চিন্তা হলো তাঁর বিদ্যালয়। সেখানে ছাত্র-ছাত্রীরা
মুক্তভাবে বিচরণ করবে ও আনন্দের সঙ্গে পাঠগ্রহণ করবে।

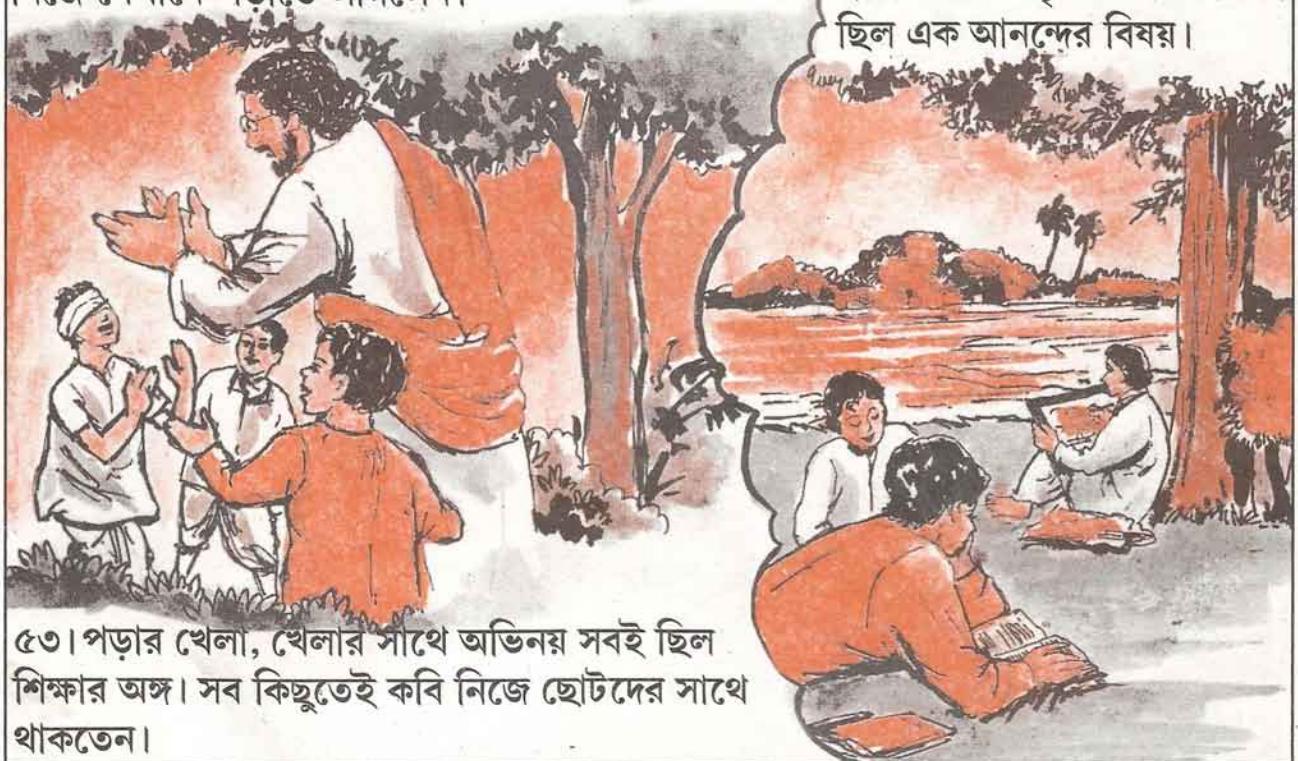


৫১। কবিপঞ্জী মৃগালিনীদেবী তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন। তাঁরা
শান্তিনিকেতনে এসে থাকবেন ঠিক করলেন। মৃগালিনী দেবীর চোখে
তখন অনেক স্বপ্ন।



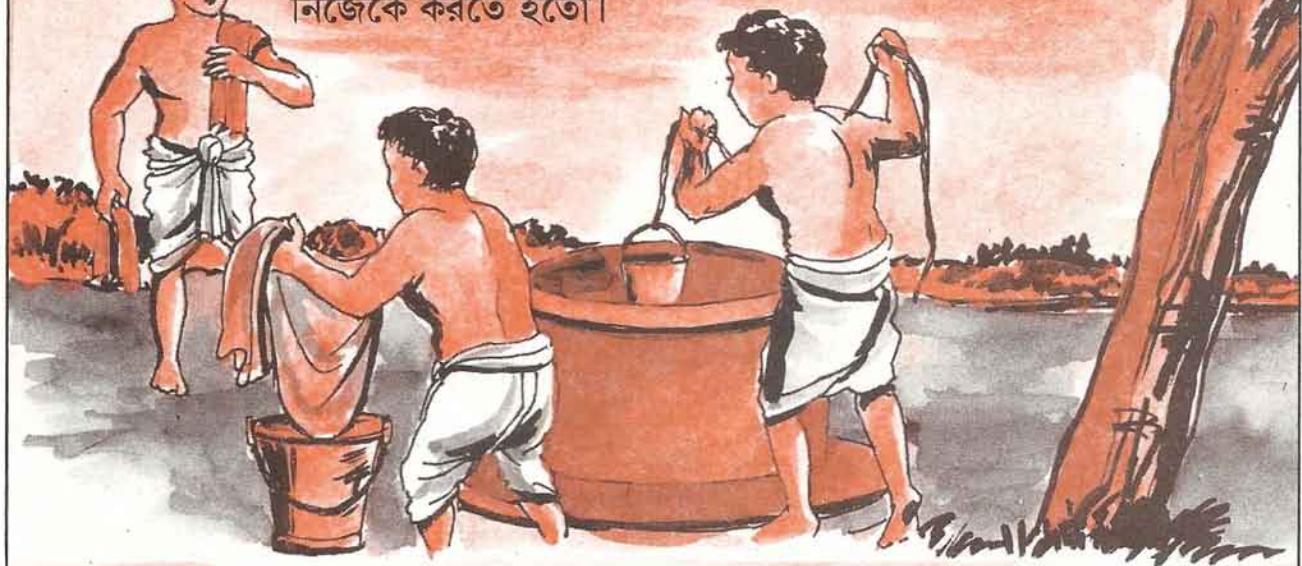
৫২। অল্প কয়েকটি ছাত্র ও
শিক্ষক নিয়ে ভারতীয় আশ্রমের আদশে
শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের উদ্বোধন হলো। রবীন্দ্রনাথ
নিজে সেখানে পড়াতে লাগলেন।

৫৪। সর্বাধিক জটিলতা মুক্ত
স্বাধীনভাবে প্রকৃতির মাঝে শিক্ষা
ছিল এক আনন্দের বিষয়।



৫৩। পড়ার খেলা, খেলার সাথে অভিনয় সবই ছিল
শিক্ষার অঙ্গ। সব কিছুতেই কবি নিজে ছোটদের সাথে
থাকতেন।

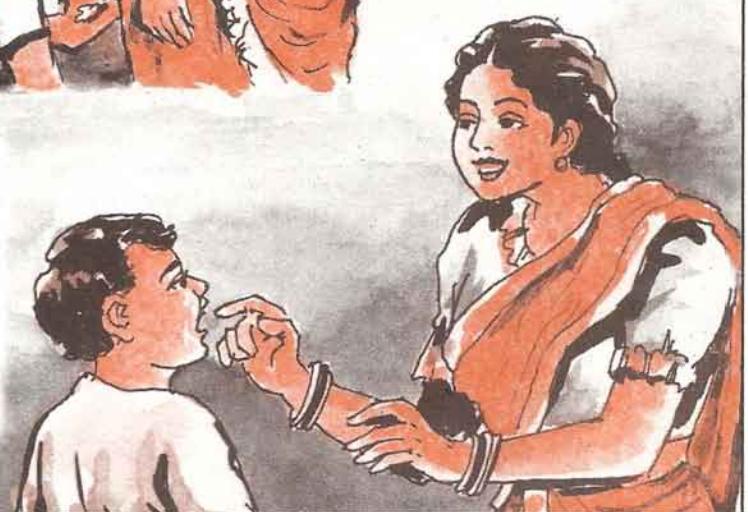
৫৪। শুধু বই পড়া নয়। সময়ানুবর্তিতা, নিয়মানুবর্তিতাও শেখানো হতো। নিয়মশৃঙ্খলা পালন করতে হতো। নিজের কাজ নিজেকে করতে হতো।



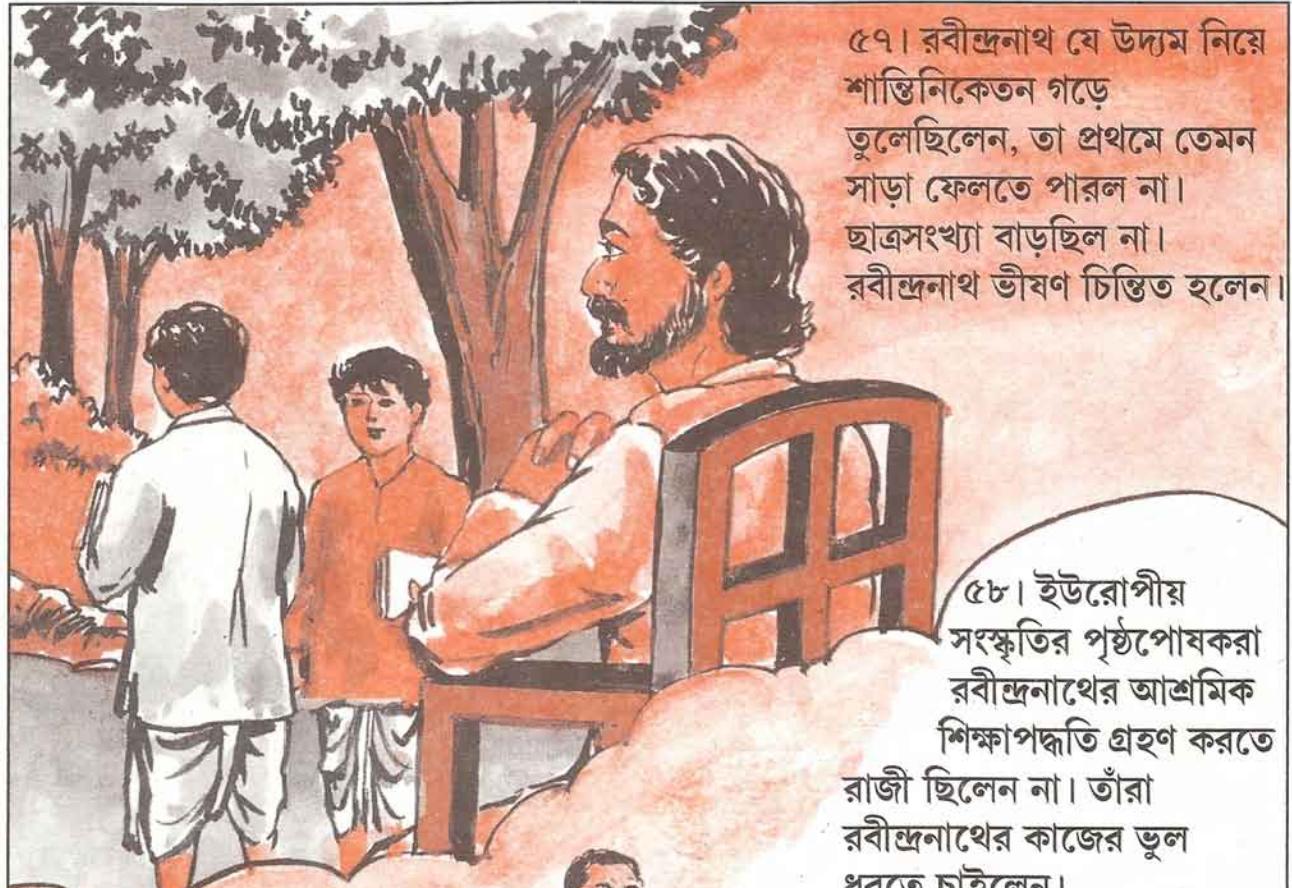
৫৫। আনন্দের সাথে সকলে নিজেদের কাজ নিজেরা করতো। কবিপত্নী মৃগালিনীদেবী তাদের পুত্রের ন্যায় ভালবাসতেন ও দেখাশোনা করতেন।



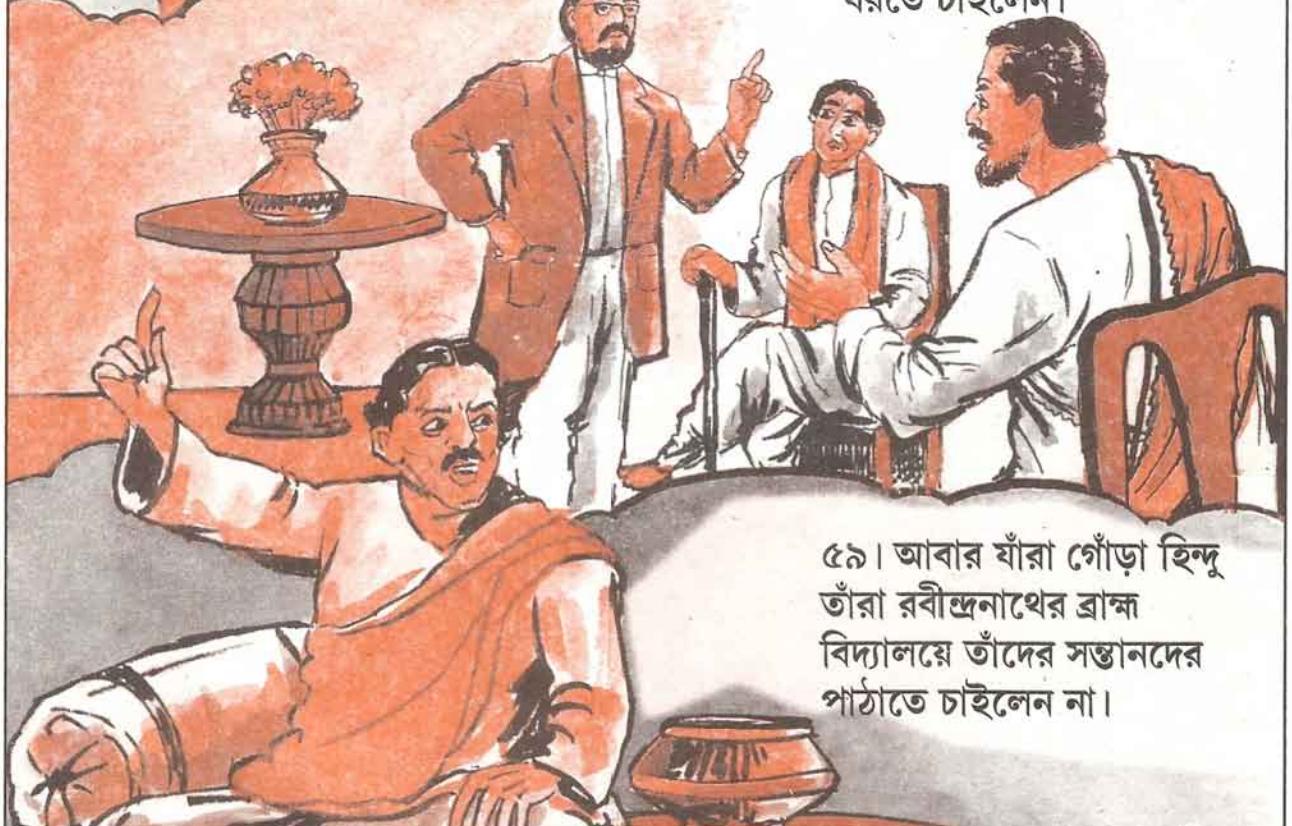
৫৬। শিক্ষার সাথে চরিত্র গঠন ও সহবত শিক্ষার দিকে গুরুত্ব দেওয়া হতো। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকেও মৃগালিনী দেবীর সজাগ দৃষ্টি ছিল।



৫৭। রবীন্দ্রনাথ যে উদ্যম নিয়ে
শাস্তিনিকেতন গড়ে
তুলেছিলেন, তা প্রথমে তেমন
সাড়া ফেলতে পারল না।
ছাত্রসংখ্যা বাড়ছিল না।
রবীন্দ্রনাথ ভীষণ চিন্তিত হলেন।

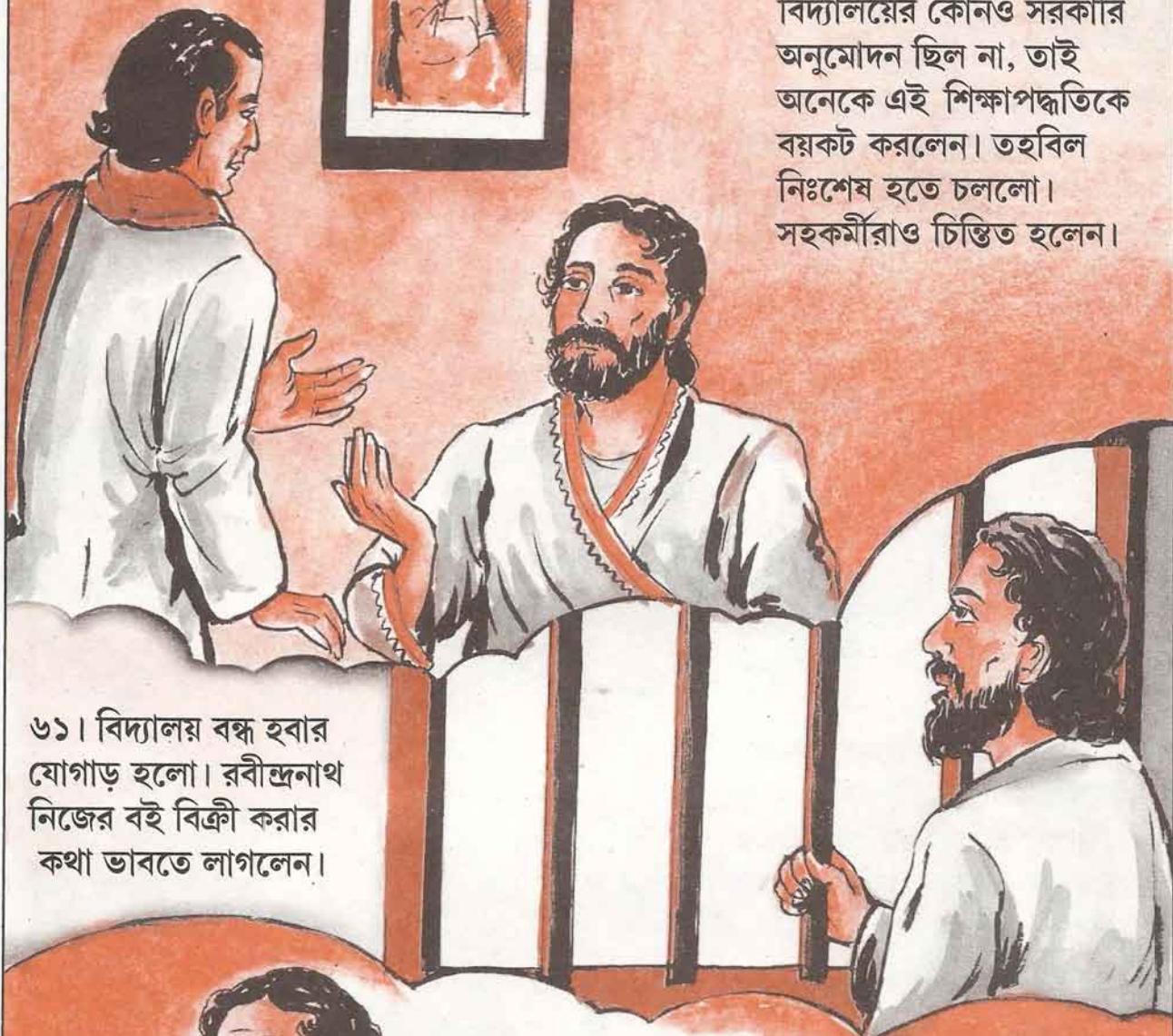


৫৮। ইউরোপীয়
সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকরা
রবীন্দ্রনাথের আশ্রমিক
শিক্ষাপদ্ধতি গ্রহণ করতে
রাজী ছিলেন না। তাঁরা
রবীন্দ্রনাথের কাজের ভুল
ধরতে চাইলেন।



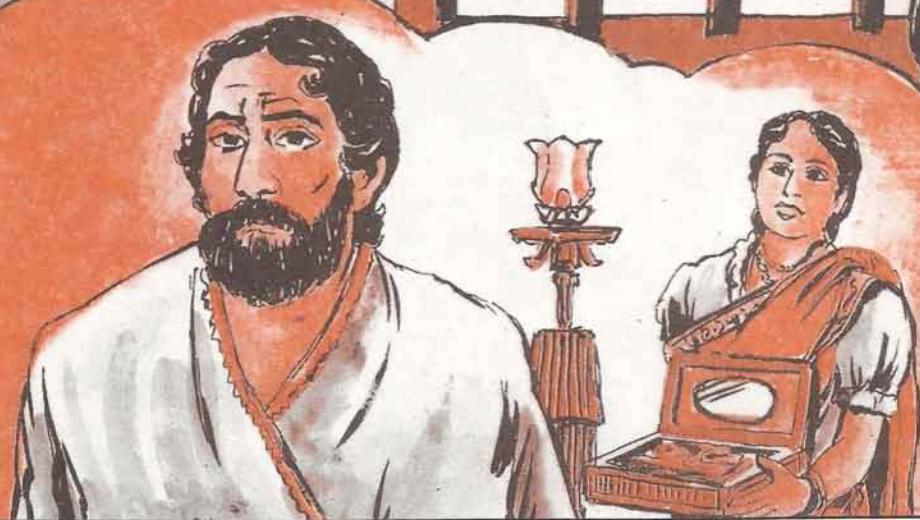
৫৯। আবার যাঁরা গেঁড়া হিন্দু
তাঁরা রবীন্দ্রনাথের ব্রাহ্ম
বিদ্যালয়ে তাঁদের সন্তানদের
পাঠাতে চাইলেন না।

৬০। যেহেতু শান্তিনিকেতন
বিদ্যালয়ের কোনও সরকারি
অনুমোদন ছিল না, তাই
অনেকে এই শিক্ষাপদ্ধতিকে
বয়কট করলেন। তবিল
নিঃশেষ হতে চললো।
সহকর্মীরাও চিপ্তি হলেন।

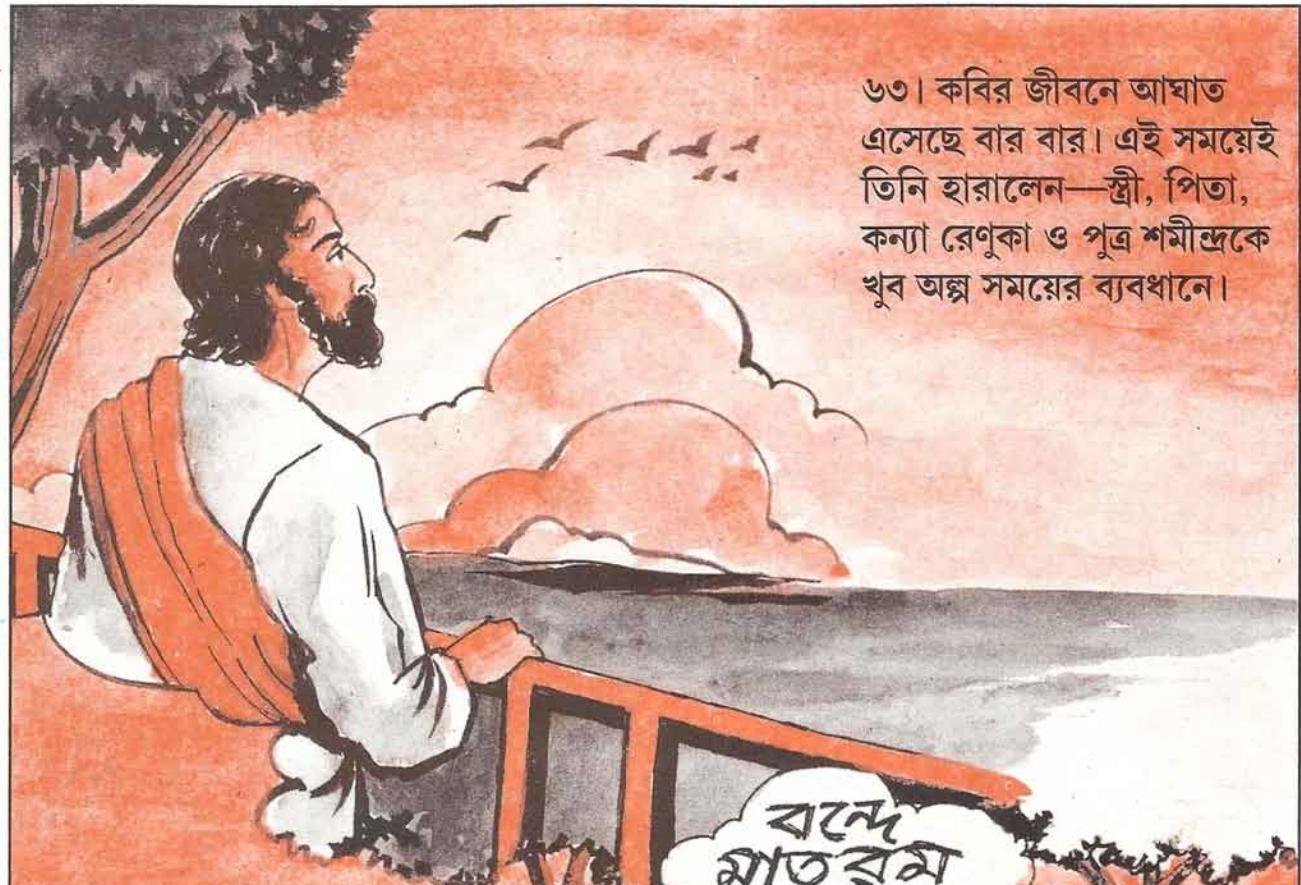


৬১। বিদ্যালয় বন্ধ হবার
যোগাড় হলো। রবীন্দ্রনাথ
নিজের বই বিক্রী করার
কথা ভাবতে লাগলেন।

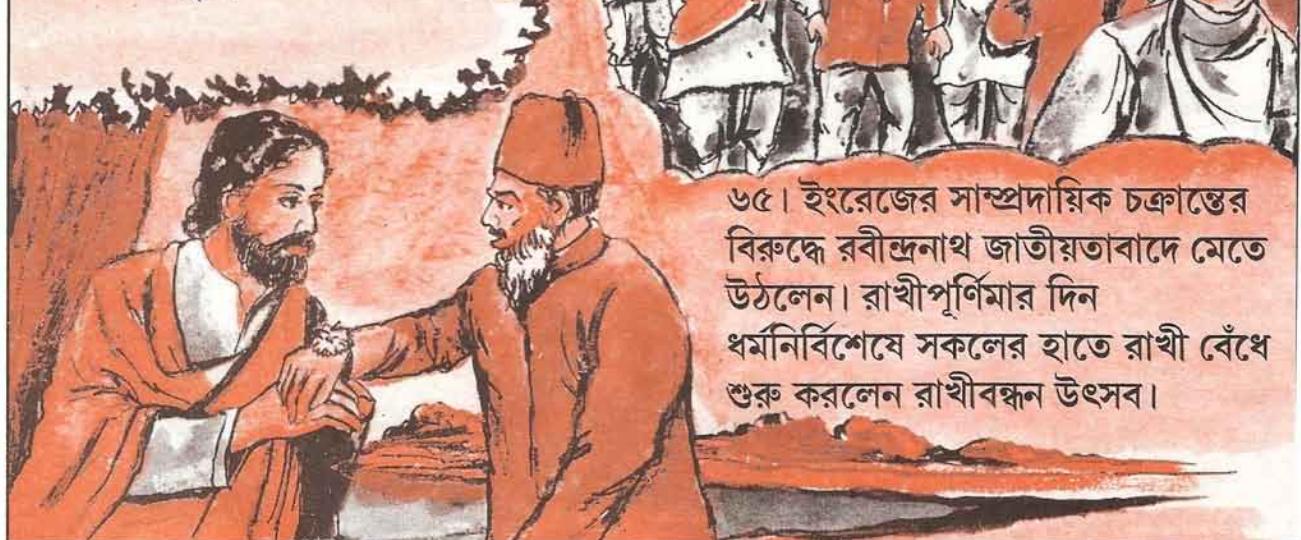
৬২। এই অবস্থায়
কবি-পত্নী
মৃগালিনীদেবী নিজের
অলঙ্কার নিয়ে এলেন
কবির কাছে। বিক্রী
করে টাকা সংগ্রহের
জন্য।



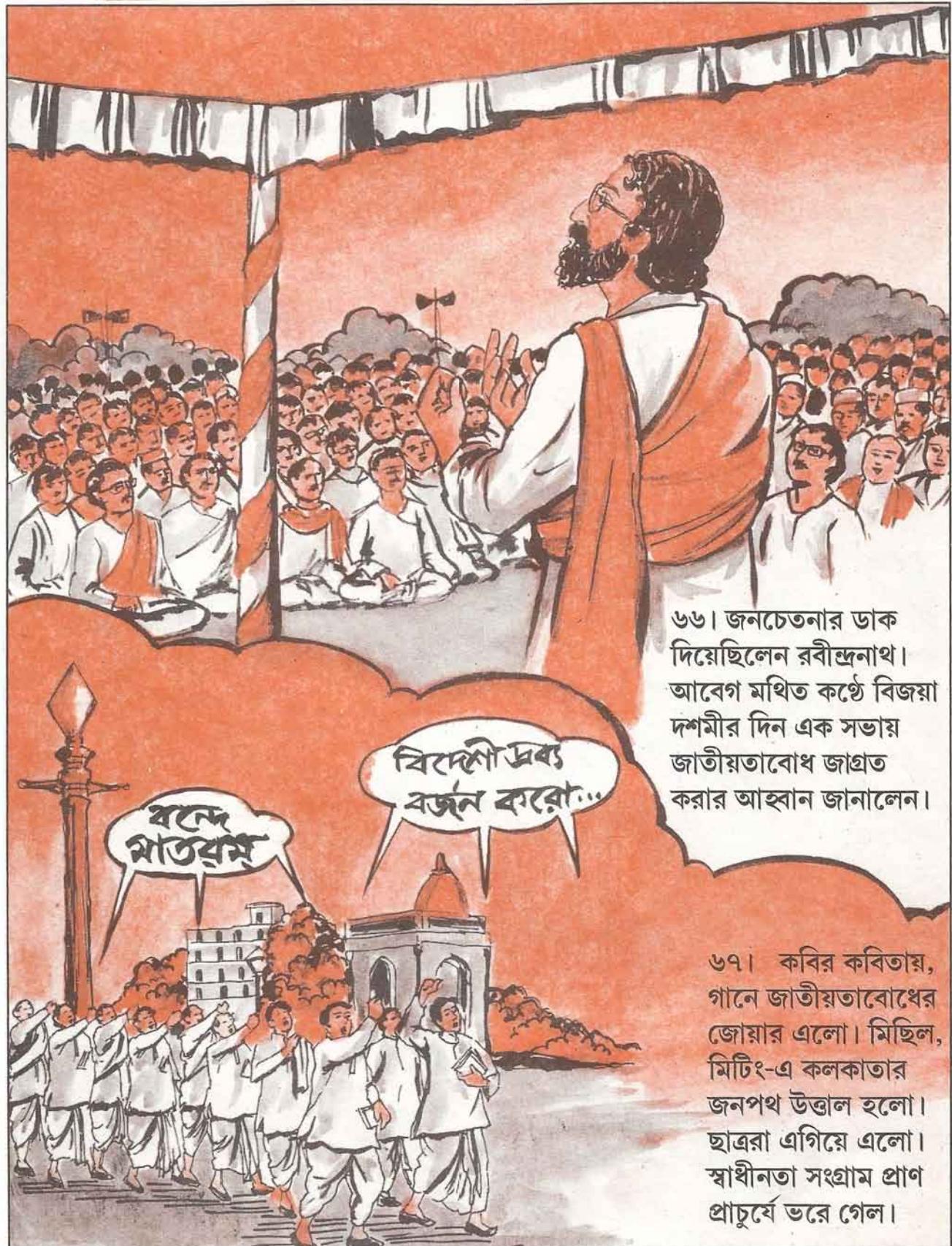
৬৩। কবির জীবনে আঘাত
এসেছে বার বার। এই সময়েই
তিনি হারালেন—স্ত্রী, পিতা,
কন্যা রেণুকা ও পুত্র শমীন্দ্রকে
খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে।



৬৪। এলো ১৯০৫ সাল। দেশের
রাজনৈতিক পরিস্থিতি অশান্ত হয়ে
উঠল। ধর্মের ভিত্তিতে বাংলা ভাগ
করা হলো। মিছিল, মিটিৎ, শ্লোগান,
আন্দোলন তুপে উঠল।



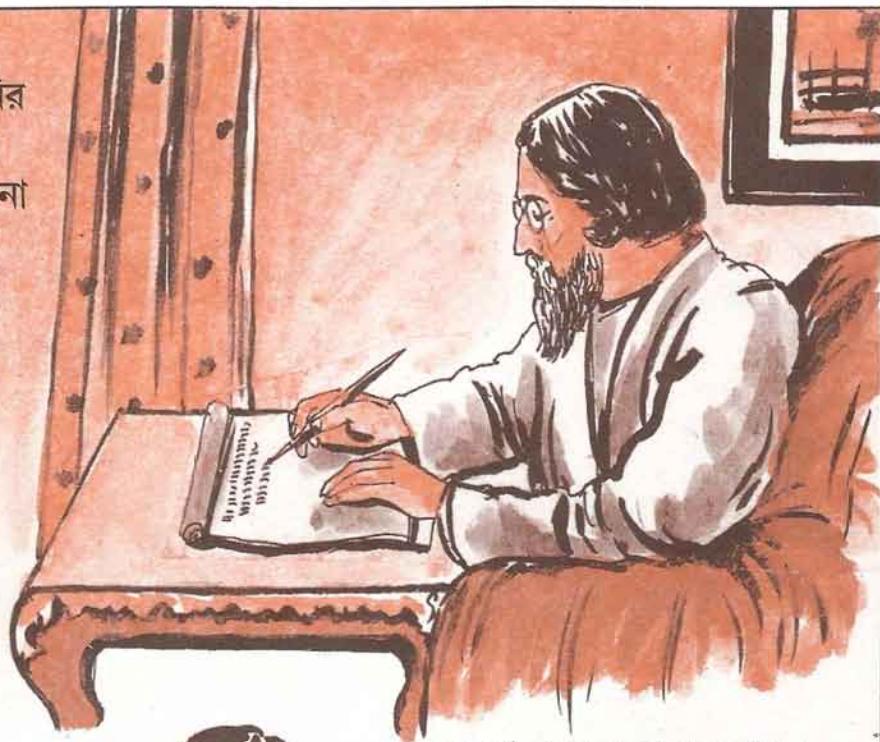
৬৫। ইংরেজের সাম্প্রদায়িক চক্রগতের
বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদে মেতে
উঠলেন। রাখীপূর্ণিমার দিন
ধর্মনির্বিশেষে সকলের হাতে রাখী বেঁধে
শুরু করলেন রাখীবন্ধন উৎসব।



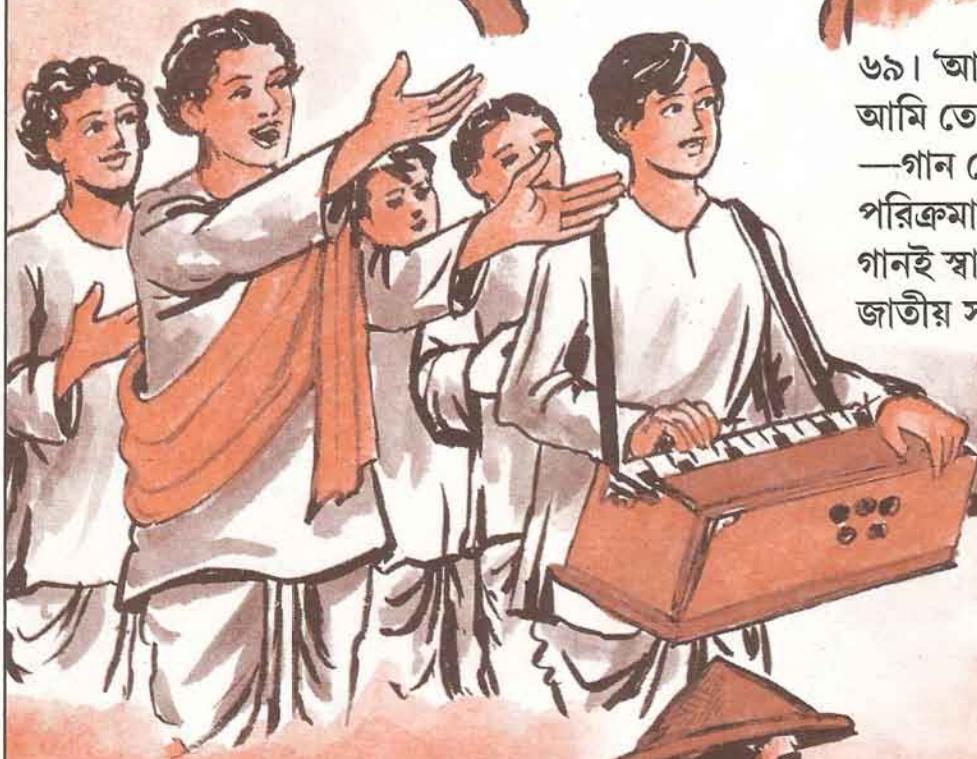
৬৬। জনচেতনার ডাক
দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।
আবেগ মথিত কঢ়ে বিজয়া
দশমীর দিন এক সভায়
জাতীয়তাবোধ জাগ্রত
করার আহ্বান জানালেন।

৬৭। কবির কবিতায়,
গানে জাতীয়তাবোধের
জোয়ার এলো। মিছিল,
মিটিৎ-এ কলকাতার
জনপথ উত্তাল হলো।
ছাত্ররা এগিয়ে এলো।
স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রাণ
প্রাচুর্যে ভরে গেল।

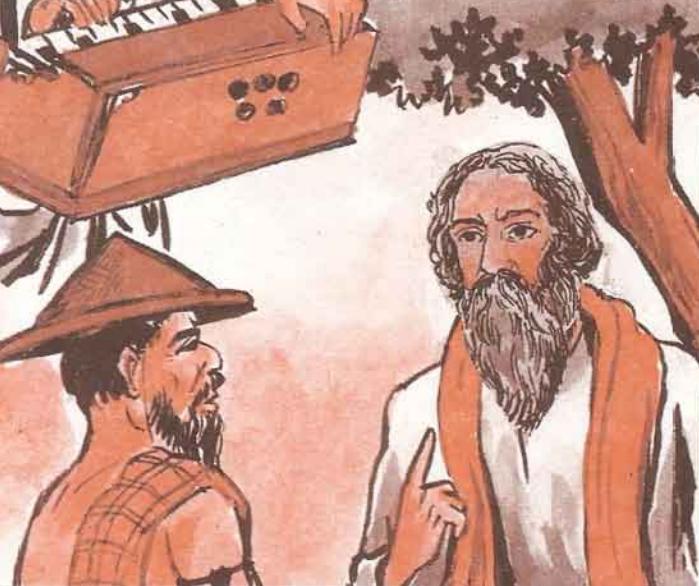
৬৮। গদ্য, পদ্য, প্রবন্ধে কবির
লেখনী ক্ষুরধার হয়ে উঠলো।
গান কবিতায় স্বাধীনতার ভাবনা
জোরদার হলো। রবীন্দ্রনাথ
জাতিকে জাগিয়ে তুললো।



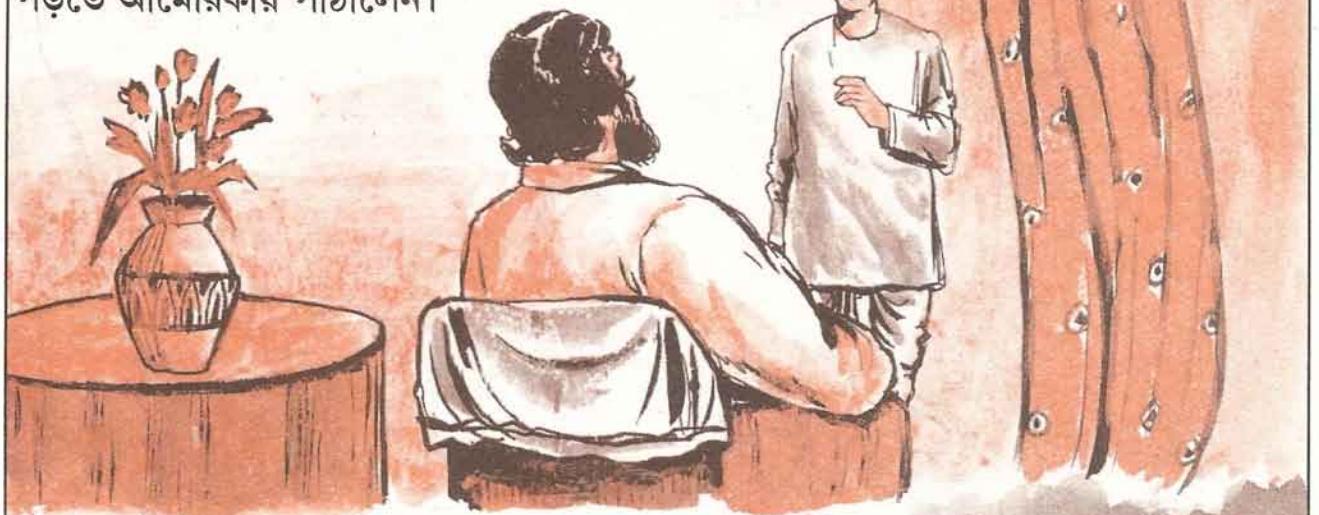
৬৯। 'আমার সোনার বাংলা
আমি তোমায় ভালবাসি'
—গান গেয়ে ছাত্ররা পথ
পরিষ্কর্মা করলো। পরে এই
গানই স্বাধীন বাংলা দেশের
জাতীয় সঙ্গীত হলো।



৭০। তিনি কৃষকদের সাথে আলোচনা
করে দেশের কৃষি পদ্ধতির সরলীকরণ
করতে চাইলেন। পল্লী পরিষদ গঠিত
হলো।



৭১। রবীন্দ্রনাথ অনুভব করলেন কৃষি উন্নয়নে আমূল
ভূমি সংস্কার প্রয়োজন। পুত্র রথীন্দ্রনাথকে কৃষি-বিজ্ঞান
পড়তে আমেরিকায় পাঠালেন।



৭২। কৃষিতে নতুন পদ্ধতির প্রচলন
করলেন—কৃষকরা এর সুফল বুঝতে পেরে এগিয়ে
এলো। কৃষকরা তাঁর প্রশংসা করতে লাগলো।



৭৩। বিদ্যাসাগর যে বিধবা
বিবাহ প্রচলন করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ
তা গ্রহণ করলেন এবং বিধবা
প্রতিমাদেবীর সঙ্গে পুত্রের বিবাহ
দিলেন।

৭৪। এই সময় বড়লাট ভারতে
এলেন। তাঁর আগমন উপলক্ষে এক
প্রশস্তি সঙ্গীত রচনা করতে তাঁকে
অনুরোধ করা হলো। এতে তিনি
ভীষণ ক্ষুঁক্ষ হলেন।



৭৫। জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে
গীত হওয়ার জন্য তিনি
লিখলেন—“জনগণ মন অধিনায়ক
....” পরবর্তীকালে এটিই হলো
আমাদের জাতীয় সঙ্গীত।



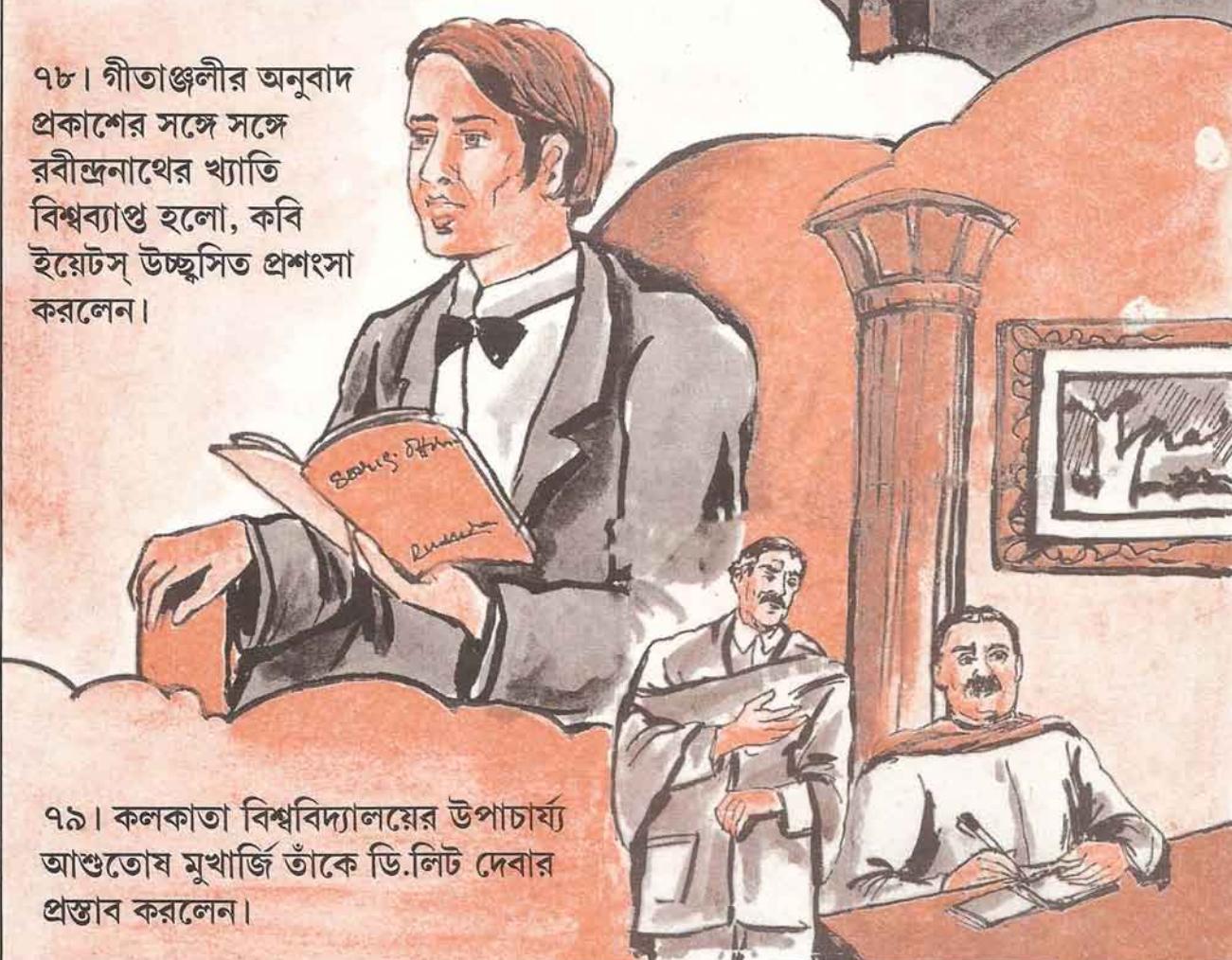
৭৬। ১৯১১ সালে বঙ্গ-
ভঙ্গ রদ করা হলো।
রবীন্দ্রনাথের কবিতা,
গানে জাতির যে জাগরণ
ঘটলো ইংরেজের
ভেদবুদ্ধি তাতে পরাজিত
হলো।



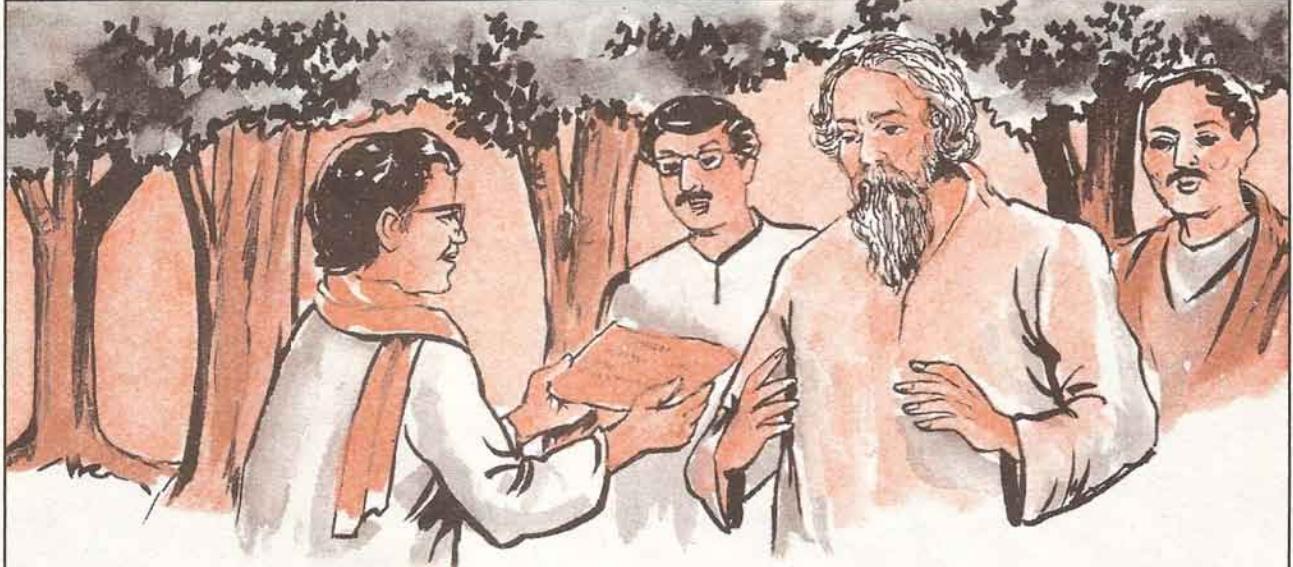
৭৭। এরপর এলেন ইংল্যান্ডে, সেখানে
চিত্রশিল্পী রামনস্টাইন তাঁকে ‘গীতাঞ্জলী’
ইংরেজীতে অনুবাদ করতে
অনুরোধ করলেন।



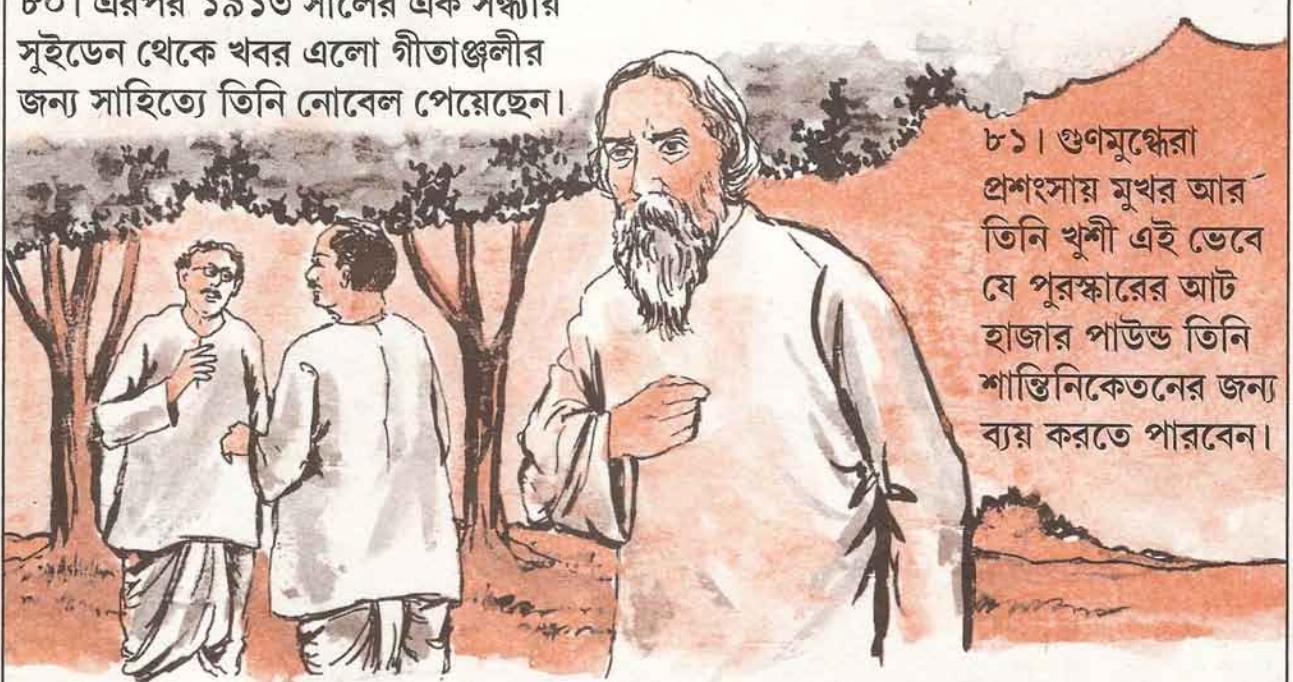
৭৮। গীতাঞ্জলীর অনুবাদ
প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে
রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি
বিশ্বব্যাপ্ত হলো, কবি
ইয়েটস্ উচ্ছুসিত প্রশংসা
করলেন।



৭৯। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য
আশুতোষ মুখার্জি তাঁকে ডি.লিট দেবার
প্রস্তাব করলেন।



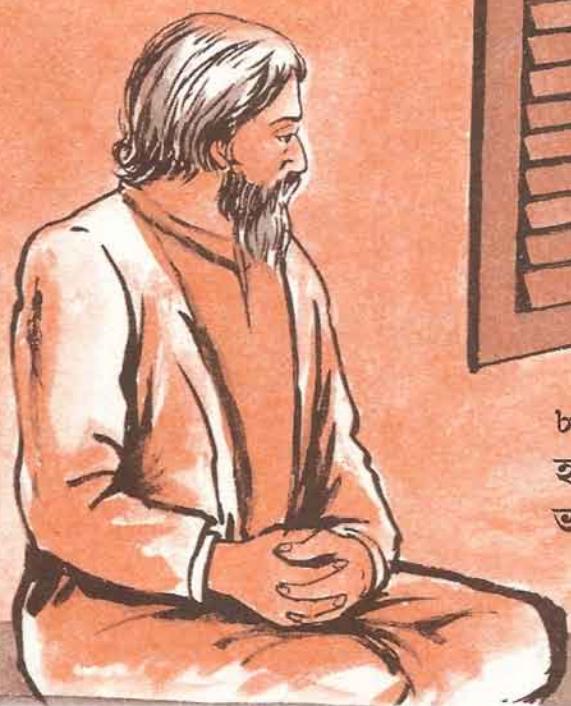
৮০। এরপর ১৯১৩ সালের এক সন্ধিয়ায়
সুইডেন থেকে খবর এলো গীতাঞ্জলীর
জন্য সাহিত্যে তিনি নোবেল পেয়েছেন।



৮২। তার মনে এলো গভীর
অভিমান। তিনি বুঝলেন বিদেশ
সম্মান না দিলে তিনি
স্বদেশীদের কাছে সম্মান পেতেন
না। তিনি উপস্থিত সকলকে
সেকথা বললেন।



৮১। গৃগমুখৈরা
প্রশংসায় মুখর আর
তিনি খুশী এই ভেবে
যে পুরস্কারের আট
হাজার পাউড তিনি
শান্তিনিকেতনের জন্য
ব্যয় করতে পারবেন।



৮৩। পরে তিনি এই আচরণের জন্য দুঃখিত হয়েছিলেন এবং সকলকে সমানভাবে ভালবাসার অঙ্গীকার করেছিলেন।

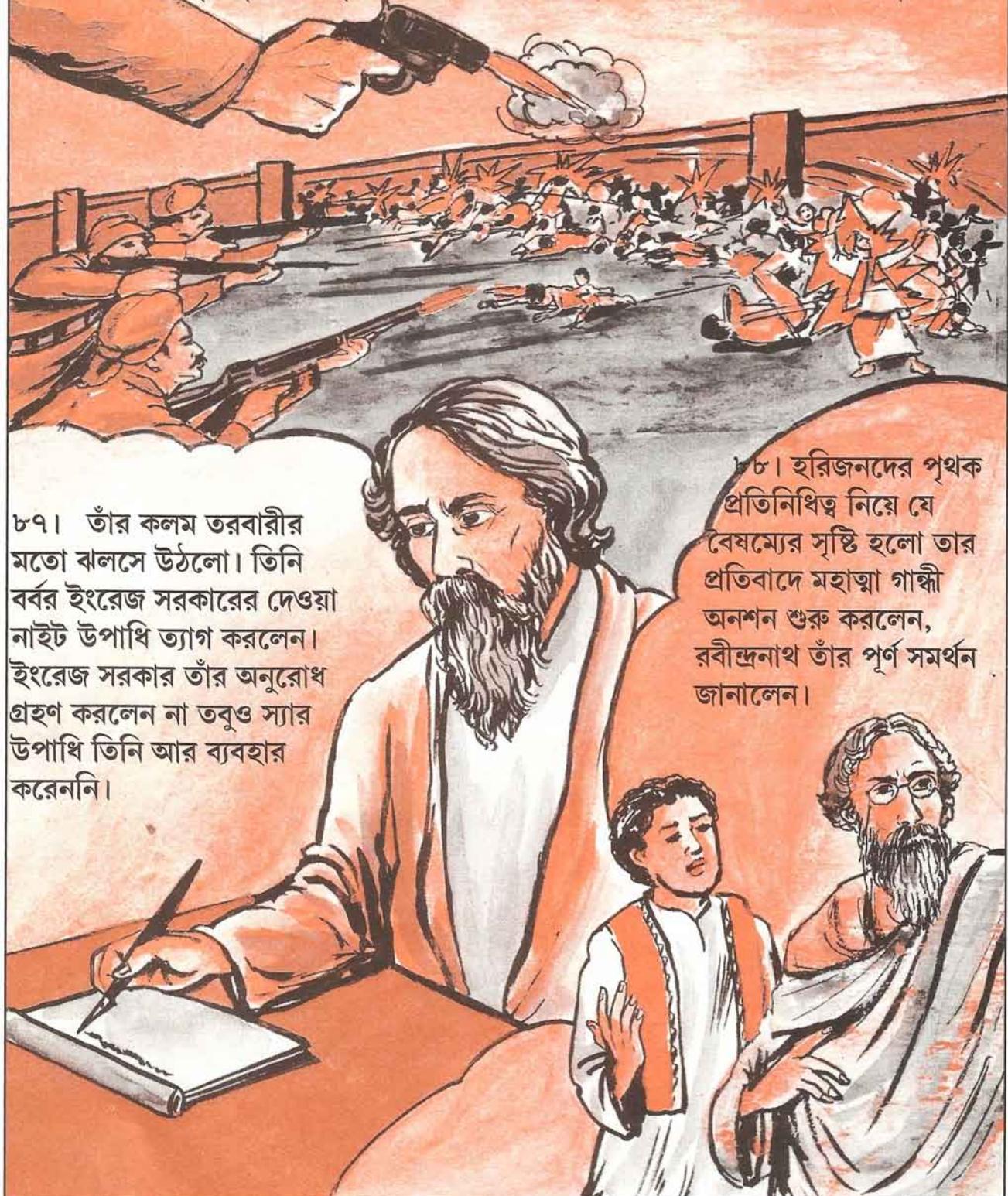
৮৪। এরপর বহুতে লাগলো
সম্মানের প্রবাহ—বৃটিশ সরকার
তাঁকে 'নাইটহুড' প্রদান করলেন।
তাঁকে সম্মান জানাতে জোড়াসাঁকোর
বাড়িতে বিরাট জন সমাগম হলো।



৮৫। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে
ডি.লিট উপাধি প্রদান করলো।



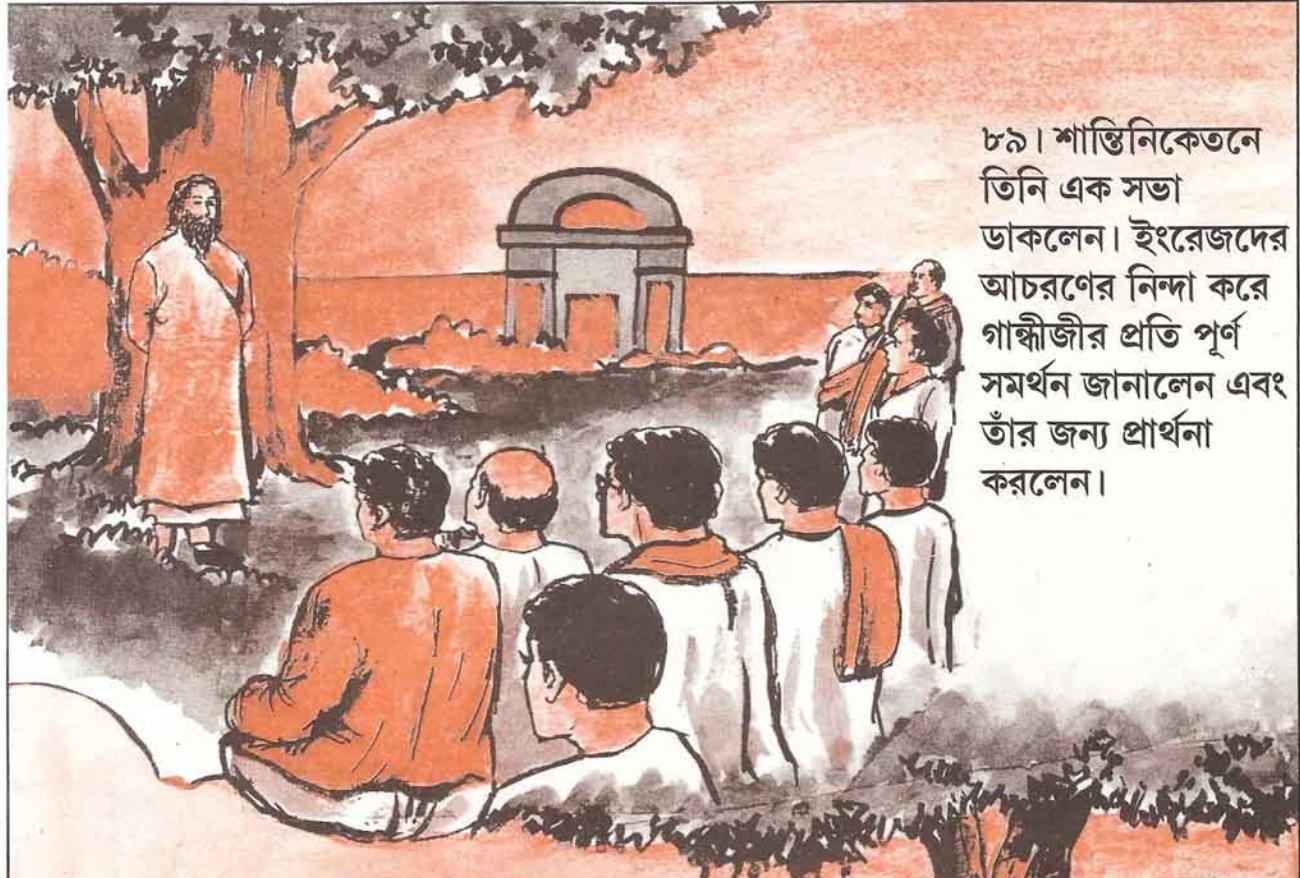
৮৬। ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগে কয়েকশত নরনারীর ওপর ইংরেজ সৈন্য গুলি চালালো। বহু মানুষ নিহত হলো। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের এই কলঙ্কময় ঘটনায় রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে বিচলিত হলেন।



৮৭। তাঁর কলম তরবারীর মতো ঝলসে উঠলো। তিনি বর্বর ইংরেজ সরকারের দেওয়া নাইট উপাধি ত্যাগ করলেন। ইংরেজ সরকার তাঁর অনুরোধ গ্রহণ করলেন না তবুও স্যার উপাধি তিনি আর ব্যবহার করেননি।

৮৮। হরিজনদের পৃথক প্রতিনিধিত্ব নিয়ে যে বৈষম্যের সৃষ্টি হলো তার প্রতিবাদে মহাত্মা গান্ধী অনশন শুরু করলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর পূর্ণ সমর্থন জানালেন।

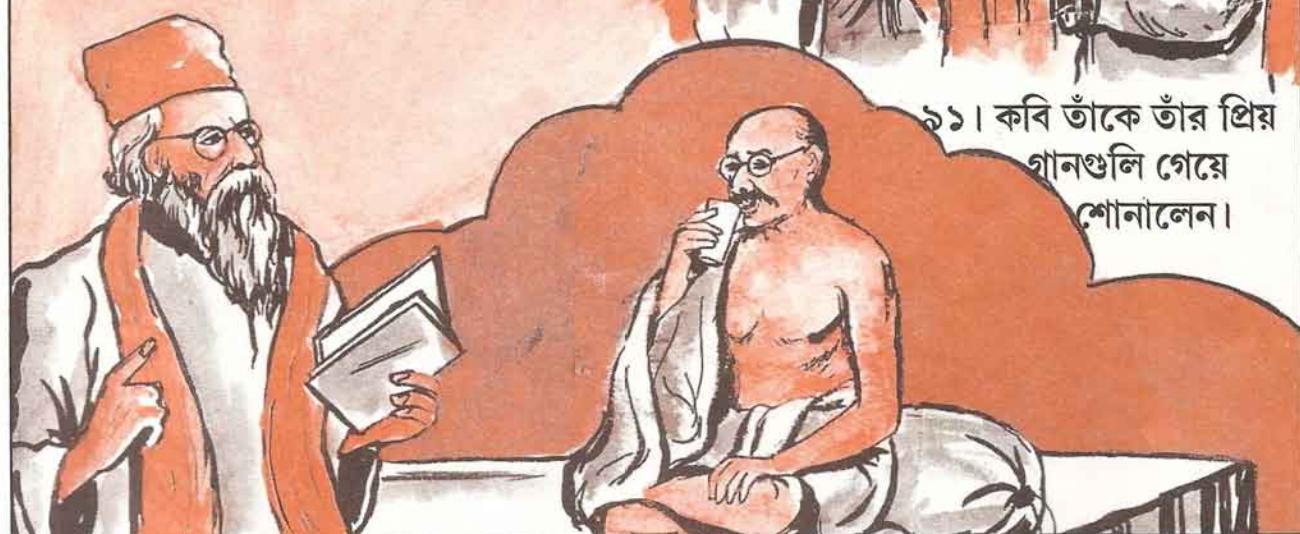
৮৯। শান্তিনিকেতনে
তিনি এক সভা
ডাকলেন। ইংরেজদের
আচরণের নিন্দা করে
গান্ধীজীর প্রতি পূর্ণ
সমর্থন জানালেন এবং
তাঁর জন্য প্রার্থনা
করলেন।



৯০। গান্ধীজীর পাশে গিয়ে তিনি
দাঁড়ালেন। সরকার মাথা নোয়াতে
বাধ্য হলো। মহাত্মা গান্ধী তাঁর
অনশন ভঙ্গ করলেন।



৯১। কবি তাঁকে তাঁর প্রিয়
গানগুলি গেয়ে
শোনালেন।



১২। উ

শাস্তিনিকেতন

আন্তর্জাতিক

শিক্ষাকেন্দ্র। শিক্ষাচর্চার

অন্য পীঠস্থান হিসাবে

সকলের শ্রদ্ধা অর্জন

করলো। বহু বিদেশী

হাত্র-ছাত্রী এসেও যোগ

দিল। আশ্রমিক ব্যবস্থার

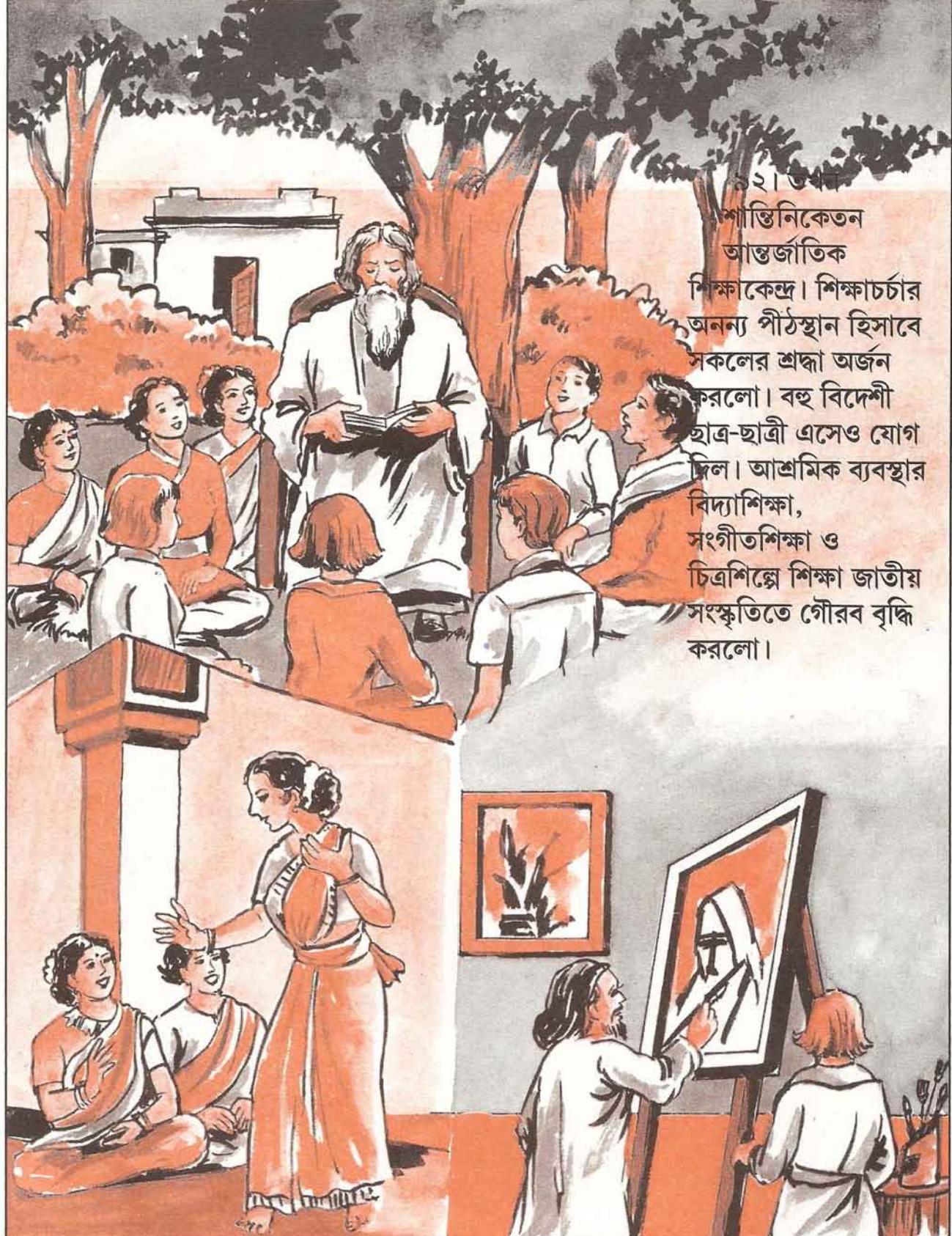
বিদ্যাশিক্ষা,

সংগীতশিক্ষা ও

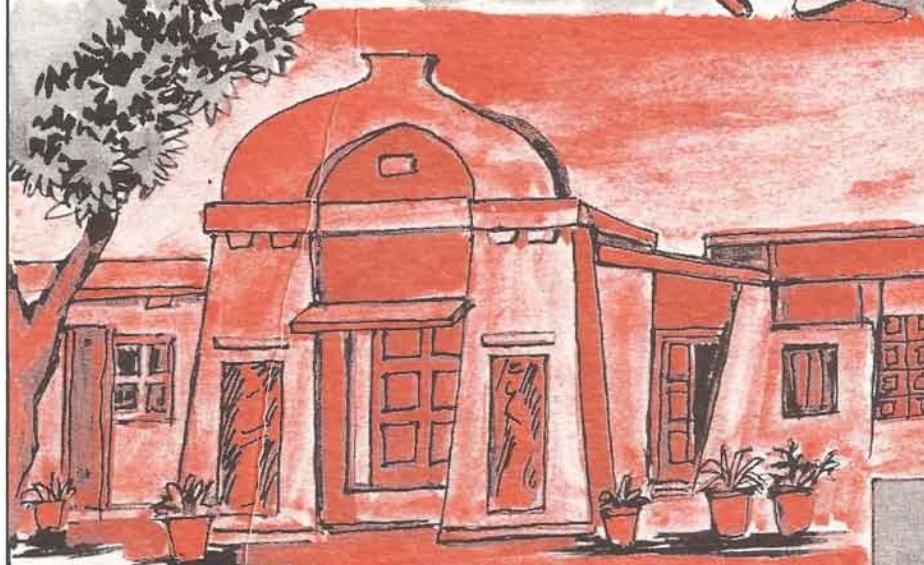
চিত্রশিল্পে শিক্ষা জাতীয়

সংস্কৃতিতে গৌরব বৃদ্ধি

করলো।



৯৩। চিন্তানায়ক ও রাষ্ট্রনায়ক জওহরলাল
নেহরু বিভিন্ন সময়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে
এসেছেন এবং তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে
মতবিনিময় করেছেন।



৯৪। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর
শাস্তিনিকেতন অঙ্গাঞ্চিক
ভাবে জড়িত। ভারত
তথা বিশ্বের অন্যতম
শ্রেষ্ঠ এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
আমাদের অন্যতম
গর্বের বিষয়।

